এতেই বেরিয়ে যাবে, হাফ-টিকিটই লাগবে হয় ত' খান ছয়েক। প্রতাপ বলেছে—দিদি না এলে উৎসবের সমস্ত বাজ্‌না বন্ধ হয়ে যাবে।

দিদি তক্ষুনিই তোরঙ্গপত্র বাঁধ্‌তে লেগে গেলেন। বল্লেন—কালকে বিকেলের গাড়িতেই তো? তা' হ'লে মোটে আর উনত্রিশ ঘণ্টা আছে,—উঃ, কতক্ষণে কাটবে!

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্ব্বাসিতা নারী বাঙ্‌লার সবুজ সান্ত্বনাসিঞ্চিত নীড়ের জন্য বাহুর দুই ব্যাকুল ডানা যেন বিস্তার করে' দিয়েছে। বল্লে—সবুজ মাঠ কতদিন দেখিনি প্রতাপ,—নুয়ে'-পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডানার মতো শাদা পাল তুলে ঘোমটা-দেওয়া বৌর মতো নৌকা নাচে, পানকৌটি ডুব দেয় জলে? মাছরাঙা,—গাঙ-শালিক? ছেলেরা উঠোনে তেম্‌নি কানামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে? হ্যারে, আর তেম্‌নি কাঠগোলাপ ফোটে,—সজনে ফুল? হাওয়ায় তেম্‌নি পাটের থোপা দোলে আর? সালি ধানের চিড়া পাওয়া যায়? কাউনের চা'ল?

রুক্ষ তামাটে মাটির নিরানন্দতা সমস্ত দেহে;—হঠাৎ যেন বাঙলার শ্যামল মাটির সুষমায় স্নান করে' ওঠে। বলে,—আমিই সব নিতকাম কর্‌ব তোর বিয়ের, যাত্রাকলস আঁকব, পিঁড়িচিত্র কর্‌ব, উলু দেব, কুলোতে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে বরণ কর্‌ব, দোরে মঙ্গলঘট দেব—

বারো বছরের মেয়ে মিনি এসে বলে,—ট্রেনে চড়লে কেমন লাগে মামাবাবু? খুব ভয় করে? গাড়ি কাৎ হ'য়ে পড়ে' যায় না, ধাক্কা লাগে না কারো সঙ্গে? কতক্ষণ লাগে যেতে বল না? সতেরো ঘণ্টা? আমি জেগেই থাকব দেখো,—কক্‌খনো ঘুম পাবে না।

অধিবাস

ছ' বছরের ছোট ভাই রতন এসে বল্লে,—ছাই জাগবি তুই। এই দেখ, একটা খ'তা সেলাই করে' নিয়েছি, আর বাবার এই কপিং পেন্সিলটা। জেগে জেগে খাতায় ইষ্টিশানগুলির নাম লিখব।

মিনি বলে,—কে কে আছে আমাদের কলকাতায়? কলকাতায় এরকম কালীপুজো হয়,—সেখানে এ রকম যাত্রাপার্টি আছে? ছাই আছে। রাত্রে থামের ওপর এমন বাতি জ্বলে সেখানে? বগলা পাখী আছে?

রতন বল্লে,—এই দেখুন আমার হকি-ষ্টিক্। নিয়ে যাব এটা। কলকাতার লোক জানে খেলতে হকি? ছাই জানে। হাত দিয়ে বল ধরলে হ্যাণ্ডবল হয় না, জানে?

প্রতাপ বল্লে,—ট্রাঙ্ক ইত্যাদি আজই গুছিয়ে রাখ দিদি, কাল ঘুম থেকে উঠে বিছানা বাঁধা যাবে। জামাইবাবুর কি ব্যবস্থা হ'বে?

দিদি জাঁদরেল ট্রাঙ্কটা বন্ধ করতে করতে বল্লেন,—চব্বিশ বছর বাদে দিন চব্বিশের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন,—আমিও। মুখ বদ্‌লানো যাবে। শুধু ভৌগোলিক হাওয়া বদলই নয়, মানসিকও। চব্বিশ বছরের কয়েদগিরির পর, ঘানি-ঘোরানোর পর একটু যদি নীল আকাশের হাত-ছানি পেলাম! জেরবার, নাকাল করে' ছেড়েছে। যখন এই বাঙ্গা দেশটায় আসি তখন রেল-লাইনের দু' ধারে সবুজ মাঠে সোঁদাল দেখেছিলাম,—আর কি ওদের দেখব, ভাবতে কান্না পাচ্ছিল। পোয়াল-খড়ে ছাওয়া ঘরগুলি,—চোরখড়কে, সেই গুলঞ্চলতা।—হ্যাঁ রে রতনা, বইগুলি সঙ্গে নিচ্ছিস্ কেন? বিয়ে বাড়িতে বিদ্যে না ফলালেও চলবে!

রতন ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে,—কলকাতার ছেলেরা এ সব বই দেখেছে? পারবে পড়তে এ সব?

প্রতাপ দিদির হাতের সযত্নরচিত লোভনীয় খাবারগুলি টায়-টায় সাবাড় করে' বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

প্রথম দেখা ট্রেনেই,—পরে এই মরা চিপা খাঁড়িটার পারে।

চক্রধরপুর ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই কি আহ্লাদেই আটখানা হ'য়ে ফাজিল মেয়ের মতো বৃষ্টি নেমে এলো। ব্যস্ত পদশব্দ ও চঞ্চল জলধ্বনি ছাপিয়ে কার একটি সলজ্জ অথচ সহাস্য, আনন্দসূচক চীৎকার,—প্রভাতের মন বল্‌ছিল ওরা এই গাড়িতেই উঠবে। মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যই যেন অন্ধকার আকাশের এই নয়নাশ্রুধারা।

মানে, মেয়েটি যখন গাড়িতে উঠে চুল এলো করে' চিপতে লাগল,—শাড়ির আঁচলটা ফের্‌তা দিয়ে বুকে জড়ালে,—পরে ফের খোঁপা তৈরি করে' চুলের কাঁটা গুঁজে' দিলে একটির পর একটি।

বৃষ্টি না ঝরলেই ভালো ছিল! ট্রেনে লোকই বা এত কম কেন? প্রতাপের চোখে ঘুম না আসবার কি কারণ?

সঙ্গের ছেলেটি ভারি মজাড়ে, আমুদে। যেমন চোকান-মুখাল, তেমনি জোরালো জোয়ান। গায়ে সাহেবি পোষাক।

ঝুমু গাড়ির চারিদিক একবার চেয়ে নিয়ে বিছানো কম্বলটার ওপর পা তুলে' বসল। কোণের ঐ ছেলেটির দিকে চেয়ে কেমন যেন ওর

একটু ভালো লাগল,—এমনিই। ঐ ছেলেটির শুধু মুখে নয়, কৃশ কাহিল কালো দেহটি ঘিরে এমন একটি মলিন স্রিয়মাণতা যে, ঝুমু মুগ্ধ হ'য়ে চার সেকেণ্ড বেশিই তাকিয়ে ফেলল হয় ত', ইচ্ছে করে দু'টি কথা কয়,—এই, কোথায় যাচ্ছেন, কেন, কবে ফিরে' যাবেন, বাড়িতে কে কে আছে?

ঝুমু চঞ্চল হ'য়ে বল্লে—দাদা, খাবারের ঝুড়িটা কোথায়? গাড়িতে উঠেই খিদে পেয়ে গেল। এখুনি না খেলে সব লুচিগুলি জুড়িয়ে সুখতলী হ'য়ে যাবে। এস হেল্‌প কর আমাকে।

প্রতাপ এই বলে'ই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল,—এরা সব মোমবাতি, এদের কাছে কেবল ঠাট-ঠমক, এদের মেজাজ অত্যন্ত টেড়া, এদের মন দেমাকে ছাপাছাপি,—এরা ঠোঁটে-কলা। তার চেয়ে তমালশ্যামলা সব্রীড়কটাক্ষা গৃহকোণের সান্ত্বনালক্ষ্মী ঢের ভালো। এরা ত' রংদার, ভেজাল, রোখো,—এর চেয়ে গেঁয়ো ছুটুলে বৌও ভালো।

জলের মধ্যে জীয়ল মাছের মতো প্রতাপের মন আইঢাই করে।

খাওয়া শেষ করে' ঝুমু বলে' উঠল—জল! তুমি কি হতভাগা দাদা, জলের কুঁজোটাই ফেলে এসেছ?—পরে স্বর নীচু করে' বল্লে—ওঁর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নাও না।

সঙ্গের ছেলেটি প্রতাপের কাছে জল চাইলে। এতে যেন ব্যস্ত হ'বার কিছুমাত্র কারণ নেই,—এম্‌নি—অতি আস্তে আস্তে প্রতাপ জল গড়িয়ে দিলে। ঝুমুই নিতে চাইল হাত বাড়িয়ে। প্রতাপ মেয়েটির দাদার হাতেই গ্লাশটা এগিয়ে দিলে।

প্রতাপ ভাবে—খালি বেশভূষার চটক, দুই চোখে ঠেকার ঠিকরে

পড়ছে—এর চেয়ে হোক্ না সে কালো কুৎসিত, নাই বা জানল কানড়া-ছাঁদে বেণী বাঁধা,—না হোলই বা লেখাপড়ায় তুখোড়,—ঢের ভালো। পাতাবাহারের চেয়ে ঢের ভালো বনতুলসী।

ঝুমু ওর দাদাকে বলে—ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ কর না,—মুখ বুজে' বসে' থাকতে ভালো লাগে তোমার?

প্রতাপের সঙ্গে দাদা মামুলি ভাবে কথা পাড়ে, প্রতাপ খালি কাটা-কাটা উত্তর দেয়, তাই আলাপ আর গড়ায় না। গায়ে পড়ে' আর কত কথা পাড়া' যায়?

কিন্তু ঐ মেয়েটির চোখে এমন নিবিড় ঔদাস্য কেন,—নিবিড় নিস্তব্ধতা! দুটি চোখ থেকে যেন শীতল অন্ধকারের মতো সহানুভূতি গলে' পড়ছে। প্রতাপ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিজা অন্ধকার দেখে আর ভাবে—

থুথুড়ো পচা ঘর, দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তুফান একটা তুড়ি দিলেই সাবাড়; মৃত্যুশয্যায় বাপ, মা'র আয়ুতেও ঘুণ লেগেছে,—সব ক'টি অপোগণ্ড শিশুই রোগা ডিগডিগে, কিন্তু সবাই পেটগজন্দর। এ জীবনটা একটা অনাবাদি জমি! চার হাজার টাকা কতদিনই বা—একটা পিলেওলা ভুষিমাখানো মেয়ে-ব্যাঙাচি,—তা'র সঙ্গেই নট্‌খটি করে' জীবন কাবু ও কাবার করে' দিতে হ'বে। পান্তাভাত ও পাঁকাল-মাছ খাবে, দশটা পাঁচটা করবে,—একটা সন্তান চিতায় আর একটা আঁতুড়ে,—এমনি হ'তে হ'তেও যে ক'টা হাতের পাঁচ থেকে যাবে,—কি করবে তারা? কোথায় তাদের ঘর, তাদের ভাত, তাদের ভবি' বংশধর?

দম বন্ধ হ'য়ে আসে,—প্রশান্ত কামরার মধ্যে মুখ টেনে এনে আবার চেয়ে দেখে মেয়েটির মুখখানিতে মলিন ও সুকোমল মমতার অনির্ব্বাণ স্নিগ্ধতা! কস্তা-কাটা খদ্দরের চাদরটা যে গায়ে টেনে দিচ্ছে,—তাও যেন ওকে স্নেহ করে',—জানলার কাচটা তুলে' দিচ্ছে; যেন বলছে, গায়ে একটা কাপড় জড়াও, ভারি ঠাণ্ডা আজ,—জানলাটা খুলে রেখো না।

দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে,—ঝুমু হেলান দিয়ে আধ শুয়ে ট্রেনের আলো দেখছে, আলোর পোকা, বাইরের বিশাল অন্ধকার, আর কোণের ঐ ছেলেটির বিষণ্ণ মুখ,—অথচ পুরুষালির কি সহজ ও সাবলীল তেজ চোখে, চাপা ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের কি স্থুঁচলো হাসি! উনি কেন ওর সঙ্গে কথা কইছেন না? বললেই ত' পারেন—এবার ঝুমুন,—আরো জল লাগবে? ছাই, একটা কিছু বললেই ত' হয়।

সঙ্গে মালপত্র কিছুই ছিল না,—খবরের কাগজে জড়ানো একখানা কাপড়ের পুঁটুলি একটা,—ড্রুগ-এ গাড়ি দাঁড়াতেই প্রতাপ তক্ষুনি লাফিয়ে নেমে গেল। যেন, যত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়! টাঙায় উঠে ও ভাবছিল, দু'টি মুহূর্ত্তের সুধাপাত্র বয়ে' যে বেড়ায়, সে নেহাৎই মূর্খ, সে-মদের রং ফ্যাকাসে হ'য়ে আসবেই, স্বাদও হ'বে পান্‌সে। শুধু শুধু—

কিন্তু বিকালের মুমূর্ষু আলো মেয়েটির চোখের পাতায় পড়ে' ওকে আরও করুণ, আরো সুমধুর করে' তুলেছে। প্রতাপ একেবারে অবাক হ'য়ে গেল।—পরনে আটপৌরে শাদা একখানি শাড়ি,—নিবিড় মমতায় পেলব সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করে' ধরেছে,—দু'খানি পা'র খানিকটা শঙ্খের

মত শাদা,—বুকের খানিকটা খোলা, তা'তে বিকেলের রোদ পড়েছে।

ঝুমুর হৃৎপিণ্ড পূজার ঘণ্টার মতো বেজে উঠল।—দাদা, ঐ যে উনি, উনি এখানেই এসেছেন দেখছি বেড়াতে। ডাক ওঁকে।

ধূলায় একবার সোনার সেফ্‌টিপিন্ হারিয়ে ফেলে পরে ফের সেটাকে পেয়ে ঝুমুর যতখানি আহ্লাদ হয়েছিল তা'র একচুলও কম নয়। শুধু আহ্লাদ নয়, দেখা পেয়ে ও যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে,—এম্‌নি। হৃদয়ের মধ্যে কোন্ জায়গাটায় যেন বেজুত লাগছিল,—ঠিক হ'য়ে গেল।

ঝুমুর দাদা নীরেন গায়ে পড়ে' খুব আলাপ করলে এবার, ঝুমুও লজ্জালুলতার মতো মুখ ঝেঁপে রইল না,—ঝুমু এবার মৌটুসকি।

বল্লে,—কবে যাচ্ছেন কলকাতায় ফিরে'?

—কাল।

—কাল? দাদা, উনিও কালই যাচ্ছেন। চমৎকার হ'বে কিন্তু, একসঙ্গে সব হল্লা করে' যাওয়া যাবে। আপনি ত' রাস্তায় একটিবারো চোখের পাতা পাতেন না, দেখলাম। কেন এসেছেন এখানে শুনতে পারি?

প্রতাপ ঢোক গিলে' বল্লে—দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌তে। আর আপনারা?

—দাদাটা শিগ্‌গিরই কালাপানি পেরবেন কিনা, তাই যাবার আগে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঘুরে' ঘুরে' দেখা করা হচ্ছে। আমি ওঁর থানাদার হ'য়ে বেরিয়েছি।

নীরেন বল্লে,—বোকা মেয়েটাকে কত বল্লুম, বি, এ পাশ কর্‌লি,—

এবার চল আমার সঙ্গে বিলেত। ভয়েই ঘাবড়ে গেছে,—কিন্তু এখানে পুনকে হ'য়ে থেকে কি সুরাহাটা হ'বে শুনি?

ঝুমু ঠোঁটের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে' বল্লে—ভয় না আরো কিছু? এখেনেই আমার কত কাজ পড়ে' আছে,—তোমরা এক একটা দিগ্বিজয়ী হও গে,—আমাদের ছোটখাটো স্নিগ্ধ সংসার-শান্তিনিকেতনই ভালো। কি বলেন?

প্রতাপ বলে,—আমি কি বলব?

ঝুমু চক্ষু উন্মীলিত করে' ওর দিকে তাকায়, সে-দৃষ্টি ওর মর্মে এসে গলে' গলে' পড়ে,—ওর কথাগুলি যেন মদের ফোঁটার মতো!

ঝুমু হঠাৎ বলে' ওঠে,—চলুন আমাদের বাড়ি, মামিমার সঙ্গে আলাপ হ'বে। আর একটু পরে, আসুন এই নদীটার পারে একটু বেড়াই। থাক্, রাত হ'য়ে যাবে—একটা টাঙা ডাক, দাদা।

টাঙায় ওঠা নিয়ে গোলমাল লাগছিল,—একজনকে গাড়োয়ানের পাশে বস্‌তেই হ'বে,—অগত্যা শুধু শুধু ভাড়া দিয়েই টাঙা তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। হেঁটেই চলল তিনজন,—মাঝখানে ঝুমু, পরে প্রতাপের ডান পাশে।

অন্ধকারে পথ হারিয়ে তিনজনে অনেক পরে মামিমার বাড়ি এসে পৌঁছুল। সারা পথ ঝুমুর কথাই পাঁচকাহন,—ওর যেন কি হয়েছে আজ। মামিমা অভ্যাগতকে দেখে ঘোম্‌টা টেনে দিলেন। ঝুমু বল্লে —বসুন। ও রকম পরের মতো জবুথবু হ'য়ে কেন? বেশ হাত প ছড়িয়ে বসুন,—কম ত' আর ঘোরা হয় নি,—আমার পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো থেঁৎলে গেছে হোঁচট্ খেয়ে খেয়ে।

অধিবাস

দিদি যেমন যত্নে পরিপাটি করে' খাবার গুছিয়ে দিয়েছিল ঠিক ততখানি যত্নে ঝুনুও খাবার এনে দিলে। প্রতাপ বল্লে,—পারব না।

ঝুনু ওর ঠোঁট দু'টি তাড়াতাড়ি নেড়ে বলছিল—খুব পারবেন। যদি অসুখ করে, সেবা করবার জন্য আমি গ্যারিন্টি রইলাম।

অন্ধকারে ঝুনুই খানিকটা পথ এগিয়ে দিলে। বল্লে—কাল খুব সকালবেলাই, ঘুম থেকে উঠে'ই, চা না খেয়েই, একরকম ছুটে'ই, মুখ-চোখ না ধুয়েই চলে আসবেন এ বাড়ি। খুব খানিকটা বেড়ানো যাবে। চাকর ডাকিয়ে একটা লণ্ঠন দেব? হ্যাঁ, শেষকালে হোঁচট্ খেয়ে পড়ুন, সে-সেবার ভার কিন্তু আমার ওপর নেই। আচ্ছা, আচ্ছা, তাও নেওয়া যাবে,—তবুও একটা আলো নিলে—

প্রতাপ বিমনা হ'য়ে একা একা পথ ধরে। পেছন থেকে তবুও কার ডাক এসে পৌঁছোয়—কাল আসবেন কিন্তু মনে করে'। কেমন থাকেন আমার জানা চাই কিন্তু।

প্রতাপ ভাবলে, কাল কক্‌খনো ওদের বাড়ি যাবে না,—খেয়ে দেয়ে এমন ঘুম দেবে যে নটার আগে আর উঠবে না। বিধাতা, আর কেন?

কিন্তু নটার আগেই ওকে উঠতে হ'ল। দিদিকে বল্লে—এখেনে এসেই এক বন্ধু জুটে' গেল। একটু দেখা করে' আসি। শিগগিরই ফিরছি,—তোমরা সব 'রেডি' হ'য়ে থাক।

ঝুনু বল্লে,—এসেছেন যা হোক্। এই আপনার ঘুম ভেঙেই আসা? কেমন আছেন? জ্বর হয় নি ত'? বলে' প্রতাপের কপালে একটু হাত রাখে। তারপর হাতের ওপর একটু।

অধিবাস

ঝাঁ ঝাঁ রোদ,—হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার মতো মিঠে লাগে, প্রতাপের মন উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে। দোর গোড়ায় দিদি দাঁড়িয়ে, প্রভাতকে পথে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে বলে' উঠলেন—তোর আক্কেলটা কি রকম শুনি? সেই কখন খাওয়া দাওয়া সেরে বেঁধে ছেঁদে কাপড় চোপড় পরে' দাঁড়িয়ে আছি সবাই,—তুই আস্‌ছিস্ না বলে' গাড়ি ডাকা হচ্ছে না। বন্ধুর বাড়ি এতক্ষণ না থাকলেই নয়? মোটে আর এক ঘণ্টা বাকি গাড়ি ছাড়বার—

রতনের একহাতে হকি ষ্টিক্, অন্যহাতে ছেঁড়া খাতা একটা,—মিনি মুখ প্রফুল্ল করে' খালি ওর জামদানি শাড়িটা মানানসই করে' বারে বারে পরছে। দিদি পর্য্যন্ত সুন্দর করে' সেজেছেন, অব্যবহৃত পুরানো গয়না ক'খানি গায়ে দিয়েছেন, কপালের মধ্যখানে ডগডগে সিন্দুর,—কাপড়ের পাড়টা চওড়া লাল।

প্রতাপ মুখ চুন করে' মিথ্যা কথা বল্লে,—এইমাত্র বাবার টেলি পেলাম, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন,—আমাকে এক্ষুনি একাই যেতে হবে। খাবার পর্য্যন্ত সময় নেই,—আমি চল্লাম। বিয়ের দিন পিছিয়ে গেছে।

দিদি কেঁদে বল্লেন,—আমাকেও নিয়ে চল্—

রতন তেম্‌নি তার হকি-ষ্টিক্ নিয়ে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, মিনির শাড়ি গুছোনো তখনো ফুরোয় না। প্রভাত মাতালের মতো বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে—দিন ঠিক হ'লে আবার আসব দিদি, ঠিক থেকো।

দিদি দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদেন,—ভাবেন, সেই পচা ভাদ্দরের

থইথই পুকুর, সেই ললিতাসন্নমীর ব্রত, প্রথম বয়সের প্রথম সুখোৎসব রাত্তি সেই বাঙলায়ই।

প্রতাপ ষ্টেশনে গিয়ে বাবার কাছে তার পাঠায়,—বিয়ের দিন পিছিয়ে দিন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ।

মধ্যপ্রদেশের ওপর মধ্যরাত্রি,—অত ভাড়া দিয়ে গাড়িতে আর চতুর্থ লোক ওঠে নি।

সন্ধ্যা হতেই নীরেন্ শুয়েছে,—খানিকক্ষণ বক্‌বকির পর অশ্রুও ঢুলে' পড়েছে বেঞ্চির ওপর। বলেছে—আপনিও আমার মাথার তলায় মাথা দিয়ে গা টান করে' শুয়ে পড়ুন।

কি অপার অকূল ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। প্রতাপ একমনে ঘুমন্ত অশ্রুকে দেখতে লাগল। সমস্ত মুখে লাবণ্যময় অপার প্রশান্তি! মুদ্রিত দু'টি ঠোঁটে যেন স্তব্ধতার সঙ্গীত,—ললাট যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, ব্রততীর মতো লীলায়িত দু'টি বাহু,—কানে এককালে দুল্ পরবে বলে' যে-জায়গায় ফুঁড়েছিল, সেটিও ও খানিকক্ষণ দেখলে। সুতনু, সুমধ্যমা ওর নব-যৌবনের সৌরভে প্রতাপের সমস্ত দেহ উন্মুখ উল্লসিত হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে কপালে ওর হাতখানি রাখলে।

অশ্রু ধীরে ধীরে ওর চোখ দু'টি মেলে বল্লে,—আমাকে ডাকছেন? এখনো ঘুমুতে যান নি?

ঝুনু উঠে' বসল, বল্লে—আপিসের খাটুনি আপনাকে একেবারে কাবু করে' ফেলেছে। খুব খাটুনি, না?

প্রতাপ ওর মমতাময় দু'টি অপরূপ চোখের পানে চেয়ে বলে,—কিন্তু কাবু ও কাবার হ'য়ে যাবার জন্যই ত' আমরা,—কেরানি। এঁদো পচা ঘরে সঙ্কীর্ণ মন ও বোবা আশা নিয়ে বসে আছি।

ঝুনু বলে—সব জানতে ইচ্ছা করে আপনার। কখন যান আপিসে? আপিস থেকে এসে কি খান, বিকেলে কি করেন,—সব বলবেন?

অশ্রু আরো একটু সরে' আসে, উধাও-ধাওয়া হাওয়ায় ওর আঁচল অগোছাল হ'য়ে ওড়ে,—ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। প্রতাপ বলে,—ঘুম থেকে উঠে বাজার করে' আসতে আসতেই আপিসের বেলা হ'য়ে যায়। হেঁটেই যেতে হয় কিনা। পাঁচটা পর্য্যন্ত কলম পিষে' যখন হেঁটে বাড়ি ফিরি তখন সন্ধ্যা হ'য়ে যায়,—একটা পাথরের বাটিতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তা'তে ঘণ্টা খানেক বাঁকানো আঙুলগুলি ডুবিয়ে রেখে সোজা, কর্ম্মঠ করি। পরে বাবার পা টিপতে বসি। গান নেই, কবিতা নেই, খেলাধূলা নেই, সঙ্গী নেই, কোন আমোদ প্রমোদ নেই,—আমাদের মধ্যে রাত জেগে জেগে ছারপোকা মারা, সঙ্গীর মধ্যে চিররুগ্ন ছোট ভাইটা, রাত্রে ওর কাছে শুই কি না। পরে হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম—

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতাপ যেন কি হ'য়ে যায়,—ঝুনুর উৎসুক হাতের ওপরে ওর হাতখানি উপহার দিতে একটুও কুণ্ঠা করে না, বলে' চলে—হঠাৎ আপনাকে দেখলাম, আপনি আমার সঙ্গে প্রতিবেশী আত্মীয়ের

মতো হেসে কথা কইলেন, স্নেহ করে' খেতে দিলেন, এই তপ্ত সান্নিধ্যটুকু দিলেন,—ভাবতে আমার মন চৈত্রের মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে' ফিরছে। অযোগ্য হতভাগ্য—একটা অক্ষম গরীব কেরানি—

ঝুনুর চোখ বেদনায় টলটল করে' উঠেছে। প্রতাপের হাত আরো একটু শক্ত করে' আপনার করে' ধরে' বল্লে—আপনাকে দেখেই যে আমার মন নিজের কাছে কত ভালো লাগছে সে কথা আপনাকে কে বল্বে?' আমি হঠাৎ যেন নিজেকে আজ চিনে ফেলেছি।—কিন্তু, মানুষকে এত দুঃখ কেন সইতে হ'বে? ভালোবাসা না পাওয়ার দুঃখের চেয়ে না খেতে পাওয়ার দুঃখ, রোগে ভুগে' পঙ্গু হওয়ার দুঃখ কী প্রচণ্ড! আপনি কেন এত দুঃখ পাবেন? না, আপনাকে পেতে দেব না।

প্রতাপ বলে—থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে' কল্‌কাতায় ষ্টেশন থেকে গাড়ি করে' বাড়ি আস্‌বার সময় পথে একটা অতিকায় দালান দেখে ভেবেছিলাম, আকাশকে মুখ-ভ্যাঙানো দাঁত-উঁচানো এম্‌নি একটা জাঁদরেল বাড়িরই বাসিন্দা হ'ব, মা আস্‌বে, বাবা বাতের চিকিৎসা কর্‌তে এসে ভালো হবেন, ছোট ভাই বোনগুলি মনের সুখে পেট পুরে' খেয়ে কুঁদে বেড়াবে,—কিন্তু বি, এ ফেল্ করে' দেখ্‌লাম তেম্‌নি একটা বিপুল-বপু লম্বোদর দালানেই আমাদের আপিস্,—একটা বিরাট অন্ধকূপ! মানুষের দুঃখ সব চেয়ে কখন্ প্রচুর ও প্রতিকারহীন জানেন?—যখন তা'র আর কোন আশা নেই। বাট বছর বয়েস হ'লেও ষাট টাকার এক আধলাও বাড়বে না, বাবা শেষ পর্য্যন্ত বিছানায়ই থাক্‌বেন।

তারপর সমস্ত রাত্রি আর কেউ কথা কয় না, জান্‌লার কাছে

মাথা দিয়ে পড়ে' থাকে,—দু'জনের হাত তেম্‌নি একটি মুঠির মধ্যে। ঘামে ভেজে, কাপড়ে মুছে' নিয়ে ফের তেম্‌নি ধরে' থাকে,—যেন চেতনা নেই! যেন ওরা ঘুমিয়ে আছে।

ভোরবেলা রূপনারাণের ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যাচ্ছিল, ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে,—দু'জনেরই মুখ বেদনায় আর্দ্র,—চার চোখের জল তখনো শিশিরের মতো শিহরিত হচ্ছে।

ষ্টেশনে গাড়ি যখন থাম্‌ল, তখনই ঝুমু বল্‌তে পারলে—আপিস্ সেরে কিন্তু আমাদের বাড়ি যাবেন। যাবেন অবিশ্যি। আমি পাথরের বাটিতে বরফ গলিয়ে রাখব। সেই জাঁদ্‌রেল আপিসে গিয়েই আমাকে ভুলে' যাবেন না দেখবেন—

পরে হাত নেড়ে বল্লে,—আমি না ভুললে কি করেই বা ভুল্‌বেন দেখব। আসা চাই কিন্তু, আমি পথ চেয়ে থাক্‌ব। বুঝলেন, পথ চেয়ে থাক্‌ব।

এখানে ওখানে করে, বন্ধুদের মেসে খেয়ে শুয়ে, আপিসে কলম পিষে' প্রতাপ দিন চারি কাটিয়ে দিলে যা হোক। দুনো উৎসাহে ও খাটে,—খেটে এত তৃপ্তি ও আর কোনোদিন পায় নি,—চেহারা খারাপ হচ্ছে বলে' ঝুমু অনুযোগ দেয় বলে'ই নিজের ওপর মায়া পড়ে। আপিসে হিসাব মেলায়,—আর মনে মনে কান পেতে শোনে, ট্রেনের চাকার সেই সুসম্বদ্ধ অথচ কর্কশ ঘর্ঘর-ধ্বনি, সেই হাতের মধ্যে হাত ঢেকে রাখা,—সেই—

বাড়ি যখন ফেরে ওর চেহারার হাল দেখে মা হাল ছেড়ে দেন, কেঁদে ওঠেন—কি হয়েছিল তোর? ঐ এক টেলি করে'ই আর কোনো খবর নেই। তুই কি কসাই!

প্রতাপের যেন বাড়ির কথাই মনে ছিল না। প্রতাপ মাকে প্রণাম করে, ছোট ভাই বোনগুলিকে একটু অকারণ আদর করে' বলে—ভালই আছি এখন।

তিন চার বার বলে।

রোগশয্যা থেকে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন—গুয়োটা যেতে না যেতেই ব্যামোয় পড়ল। তখনই বলেছিলাম ঐ অজ্ঞাত দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর, এমন কি ব্যামোই হ'ল যে একেবারে বিছানা গাড়তে হ'ল! অলুক্ষুনে কোথাকার। এদিকে এত বড় দাঁওটা তো গেল ফসকে,—ওরা অন্য জায়গায় ভিড়েছে। এবারে কলা চোষ'—

প্রতাপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু সংসার কি করে' চলবে?

বিধাতাই এর বন্দোবস্ত করে' দিলেন,—একান্ত মামুলি ভাবে। আধুনিক কথাশিল্পীর মতো বিধাতারও আর মৌলিকতা নেই কোনো—

তিন দিনের আড়াআড়িতে তৃতীয় ও চতুর্থ বোন কলেরাতে মারা গেল হঠাৎ,—এক থালায় বসে' দুই বোন্ একই বাসি খাবার খেয়েছিল।

কুড়ি টাকা করে আর জমাতে হয় না,—দুইটি গ্রাস বুজল, আরও

বেড়ে গেল হঠাৎ। এ ক'দিন যতগুলি জমেছিল সেগুলিও বাবা একদিন তুলিয়ে আন্‌লেন।

আপিস থেকে ফেরবার সময় মাঠে প্রতাপ অনেকক্ষণ জিরিয়ে নেয়,—এক দমকে অনেকগুলি কদম আর ফেল্‌তে পারে না! শোকাচ্ছন্ন প্রদোষে ওর কালো, অর্দ্ধভুক্ত, অপরিচ্ছন্ন বোন্ দু'টির মুখ মনে পড়ে,—সংসারের সমস্ত উৎপীড়ন ও অপমান নির্ব্বিবাদে একান্ত অপরাধীর মতো বহন কর্‌তো ওরা,—একখানা ভালো কাপড় পরে নি কোনোদিন, মুখ ফুটে কোনো আবদার করে নি, মা'র সঙ্গে সঙ্গে রেঁধেছে, বাসন মেজেছে, কাপড় কেচেছে,—আর ওদের বিয়ে দিতে পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হ'বে এই ভয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খালি কেঁদেছে। যদি ওরা বাঁচত,—প্রতাপ ভাবছিল—ওরা শত কুৎসিত হলেও ওদের হৃদয় কি আর কারু হৃদয় ছুঁয়ে বাজিয়ে ধন্য করতে পারত না?

ঝুনু ওকে একেবারে ওর তেতলার ঘরে নিয়ে এল, বিছানা পেতে দিলে,—বল্লে—শোও লক্ষ্মীটি, আমি মাথা টিপে' দিচ্ছি—

ঝুনুর মাথার ওপর একটা ভিজা লাল গামছা চাপানো,—চুলগুলি বোষ্টমিদের মতো ঝুঁটি করে' বাঁধা, একখানি সাদাসিধে আধ ময়লা পাৎলা শাড়ি পরনে,—কুচকুচে কালো চওড়া পাড়,—গায়ে শুধু একটা সেমিজ,—শাদা নয়, গোলাপী।

প্রতাপ ঝুনুর ফিট্‌ফাট্ নরম বিছানার ওপর গা এলিয়ে শোয়,—ঝুনু

শিয়রে বসে' অতি ধীরে ধীরে কাঁঠালচাঁপার কলির মতো কোমল ও শুভ্র ওর আঙুলগুলি বুলায় ভালোবেসে, আদর করে'। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সমস্তটি হৃদয় যেন জলের মতো ঢেলে দিতে চায়।

গুঞ্জনক্লান্ত নিস্তব্ধ দুপহর—

প্রতাপ ওর মরা দু'টি বোনের কথা আস্তে আস্তে বলে,—মা শোকশয্যায় একান্ত শ্রান্ত,—এ ক'দিন ওকেই দু'বেলা রাঁধতে হচ্ছে, কিছু ভালো লাগে না আর,—কত দীর্ঘ দিনের মেয়াদ কবে ফুরোবে, কে বলতে পারে?

স্বপ্ন এক হাতে নিজের অশ্রু মোছে, অন্য হাতে ওর চোখ মুছে দেয়। প্রতাপ বলে—এ চোখে জল নেই—অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এই। এমনি তোমার হাত রাখ।

স্বপ্নর ইচ্ছা হয় বলতে,—আমাকে নিয়ে চল তোমার বাড়ি, তোমাদের জন্য দুটো ভাত ফুটিয়ে দিয়ে আসি। মা'র সেবা করি,—তোমার।

বলতে পারে না।

প্রতাপের বলতে ইচ্ছা হয়,—আমাদের ঘর পচা নোংরা এঁদো—তবু, তুমি সেখানে যাবে স্বপ্ন? কেনই বা যাবে? কিন্তু যদি যাও—তোমার এই কল্যাণদৃষ্টি, এই স্নেহসুখস্পর্শ, এই নিষ্কলুষ সেবা পেয়ে আমি হয়ত না-খাওয়ার দুঃখও ভুলতে পারব। কিন্তু তুমি?—ছিঃ, আমি একটা কি? বি, এ-টা পর্য্যন্ত পাশ করতে পারিনি। যে ঘাস কাটে, সে পর্য্যন্ত পারে।

পারে না বলতে!

অধিবাস

শুধু, ঝুনু প্রতাপের ঘাড়ের তলা থেকে বালিশ দুটো সরিয়ে ওর মাথা নিজের প্রসারিত কোলের ওপর টেনে নেয়। পাখীর পালকের মতো কোমল ও উত্তপ্ত ঝুনুর বুকের ওপর মুখ রেখে প্রতাপ কাঁপে। ঝুনুর ঘুমন্ত যৌবন যেন ময়ূরের মতো সর্ব্বাঙ্গে পেখম মেলে ধরে।

ঝুনু ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—একটা বাইক্ কিনে নিলে তোমার খুব সুবিধে হবে। আমি টাকা দেব, মনোমত দেখে একটা কিনে' নিও। মোটর-বাইক্ কিনবে?—সঙ্গে সাইড-কার?

দুই চোখে রহস্যময় ইঙ্গিত,— অথচ স্নেহে কি নমনীয়!

ঝুনু নিজে ওর মুখটা বুকের ওপর চেপে ধরে' বলে—তারপর—আর এবার থেকে একদিনও হেঁটে আপিস্ যেতে পাবে না যদ্দিন না বাইক্ হয়। ট্রামে করে' যেতে হবে। বাড়িতে একটা ঠাকুর রাখ সম্প্রতি, সেই রাঁধুক,—ঝি কি চাকর যা সুবিধা হয়, একটা রাখ। বুঝলে? সব আমি দেব।

প্রতাপ চোখ তুলে' বলে—তুমি পাগল হ'য়ে গেছ নাকি? পাগলি!

—পাগলি মানে? আমার বাক্সে যে কতগুলি টাকা আছে পড়ে', তা কিসের জন্য শুনি? আর শোন, এবার থেকে আপিসেই টিফিনের বন্দোবস্ত ক'রো একটা,—পেট ভরে যেন,—শরীর নিয়ে গাফিলি ক'রো না। আমি না হয় পাগলি, কিন্তু তুমি লক্ষ্মীটি হ'য়ে আমার কথা শুনো, কেমন?

বুকের থেকে ধীরে ধীরে প্রতাপের মুখ তুলে' একটু কি ভেবে বালিশের ওপর রেখে ও উঠে দাঁড়ায়। একটা আলমারি খুলে' কতকগুলি

জামা বের করে বলে—তোমার জন্য এই কয়েকটা পাঞ্জাবি করেছি,—সেদিন ভিজে এসে যে জামাটা ছেড়ে গেছলে সেটার মাপে। আর এই কয়েকখানা রুমাল। খবরদার, তুমি কিন্তু একটুও আপত্তি করতে পারবে না,—ধোপাবাড়ি থেকে কাচিয়ে এনে গায়ে দিয়ে একদিন আস্‌তে হবে কিন্তু,—তোমার নেমন্তন্ন রইল।

সমস্তগুলি জামা ও রুমাল পরিপাটি করে' ভাঁজ করে' একটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ায়, পরে একটা লাল সুতো দিয়ে বাঁধে, বাড়তি সুতোটা দাঁত দিয়ে কাটে, গুতিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দেয়।

এগুলি ঝুনু বসে' বসে' ওর জন্যেই তৈরি করেছে ওকে স্মরণ করে',—মুগ্ধ হ'য়ে প্রভাত তাই ভাবে,—ওর ছোট বোন্ দু'টির কথা আবার মনে হয়।

প্রত্যেকটি জামা ও রুমালের কোণে কোণে প্রতাপ ও ঝুনুর আদ্যাক্ষর দু'টি একত্রে গাঁথা আছে,—প্রতাপের চোখে তা এখনো পড়ে নি। তবু মুখ ফুটে' বল্‌তে পারে না ঝুনু।

তুমি বল্‌তে পারবে না,—ভাষার বদলে বিধাতা মানুষকে এ অভিশাপ দিয়েছেন। বিধাতাও বল্‌তে পারে নি।

ঝুনু ষ্টোভ্ ধরায়। নিম্‌কি ভাজে। বলে—আমার পাশে এসে বোস।

প্রতাপ ওর কাছে বসে' বলে—তুমি রাঁধছ, আর আমি তোমার এত কাছে বসে' আছি, এ কথা আমি ভাবতে পারছি না।

—আর, কা'র জন্যই বা রাঁধছি?

—আমার জন্য।

অধিবাস

অস্ফুট দু'টি কথা,—কিন্তু যেন সম্পূর্ণ নয়।

দু' জনে খায় একসঙ্গে—খাইয়েও দেয়। আঙুলগুলি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে ঝুনু একটু হাসে।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে।

যাবার বেলায় ঝুনু বল্লে—দয়া করে' এই দশটা টাকা নিয়ে যাও,—

প্রতাপ দু'হাত সরে' গিয়ে বল্লে—তুমি কি বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে ফেল্‌লে নাকি?

ঝুনু তেমনি সহজ সুরেই বল্লে—মোটেই না। তোমার কষ্টের সময় বন্ধুর থেকে নিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করা উচিত নয়। আমি যে তোমায় বন্ধু,—সখা।

—আমার যে কষ্ট, তা কি করে' বুঝ্‌লে?

—সে বোঝবার অন্তর্দৃষ্টি আমার আছে,—তোমার নেই বলে'? নাও, এস এগিয়ে, পকেটে ফেলে দিচ্ছি। যে ক'দিন যায়। এস—

—ধার দিচ্ছ? ধার ত' আমি চাই নি।

—আমি কোনো জিনিসই ধার দিতে শিখিনি। আমার ব্যবসাদারি বুদ্ধি তত ধারালো নয়!

—তবে ভিক্ষা?

—ছিঃ, কি যে বল যা তা। এস, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, তোমার মাথায় রুমাল বেঁধে দিই একটা। নাও, দুষ্টুমি ক'রো না। আপিসে টিফিনের একটা বন্দোবস্ত করে' ফেলো। পরে আর দু'চার দিনের মধ্যে—যাচ্ছ যে!

প্রতাপ বল্লে—তোমার কাছে অর্থ ভিক্ষা কর্‌তে আসি নি।

ঝুনুর দুই চোখ কান্নায় করুণ হ'য়ে এল—তোমাকে অপমান কর্‌লাম বুঝি? বা রে, আমি বুঝি তোমার পর? আমার কাছে থেকে বুঝি—

প্রতাপ চলে' যায়।

কতদূর গিয়েই ফের ফিরে আসে। পা চল্‌তে চায় না।

ঝুনু সেই বিছানায় উবু হ'য়ে শুয়ে আছে,—বালিশের উপর চুলগুলি এলো করে' দেওয়া,—সেমিজের ধার দিয়ে খোলা খানিকটা পিঠ—সারা মেঝেয় নোটটা টুক্‌রো করে' ছেঁড়া।

খোলা পিঠের ওপর হাত রেখে প্রতাপ বল্লে—ওঠ, এবার যে তুমি দুষ্টুমি কর্‌ছ! সত্যি সত্যিই পকেটে একটাও পয়সা নেই,—কি করে' যাব তবে? হেঁটে? সে যে অনেক দূর। ওঠ।

তারপর ঝুনুর ঘামে-ভিজা হাতখানি ধরে; আরো কিছু বল্‌তে চায় হয়ত। হয়ত,—তোমার কাছে এইই চাই, তোমার হাত।—বলা যায় না।

ঝুনু কথা কয় না।

মেঝের থেকে নোটের কয়েকটা ছেঁড়া টুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়ে প্রতাপ চলে' যায়। পায়ে হেঁটেই।

ঝুনুর বাবার সঙ্গে প্রতাপের আলাপ সেই প্রথম,—যেদিন সবাই

নীরেনকে জাহাজে তুলে' দিতে ঘাটে জড়ো হয়েছিল। তেজী টগবগে ঘোড়ার মতো নীরেন, প্রভাতের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে—চল্লাম ভাই, তোমার চেনাশুনো সবাইকে আমার কথা ব'লো,—গুরুজনদের প্রণাম দিও, চিঠি লিখ্‌লে জবাব দিতে ভুলো না।

সামান্য বি, এ পাশ কর্‌তে পারে নি,—একেবারে বয়াটে; সামান্য একটা আপিসে রোথো চাকরি করে—প্রভাতকে দেখে ঝুনুর বাবা দস্তুরমতো বিরক্তই হ'লেন। প্রথমদর্শনে লোকের প্রতি ঘৃণাও হয়।

গাড়িতে উঠে ঝুনু বল্‌ছিল—তুমিও আমাদের সঙ্গে এস না প্রতাপবাবু, তোমাকে একেবারে নামিয়ে দিয়ে যাব।

বাবা বল্লেন—তা হ'লে আমার দেরি হ'য়ে যাবে।—বেশ বিরক্ত হ'য়েই বল্লেন।

রবিবারের ডুপুরটা ঘুমে-ভরা, মোহময়। একটা সোফায় একটি কোণে ডু'জনে ঘেঁষাঘেঁষি বসে' আছে,—একটা কিছু করা ভালো বলেই ঝুনু সেলাই কর্‌ছে,—আর প্রতাপ বিভোর হ'য়ে তাকে দেখ্‌ছে, যেমন বিভোর হ'য়ে এক-একদিন ও অমাবস্যা রাত্রির আকাশ দেখে নিবিড়শ্যাম অরণ্য দেখে। ঝুনুর দেহের দুয়ারে ওর দেহ যেন বৈরাগী বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে ফেরে।

ঘরের দোর ঠেলে যিনি এলেন, তিনি ঝুনুর জেঠ্‌তুতো বড়দা,—প্রথম পত্নীবিয়োগের পর থেকে ব্রহ্মচারী আছেন বলে' গর্ব করেন। তিনি হঠাৎ যেন কেউটে দেখেছেন,—মুখ চোখের ভাব এম্‌নি।

সমস্ত রোদের গায়ে কে যেন কাদা ছিটিয়ে দিল,—কালি।

তারপর আর একদিন প্রভাত যখন ঢুক্‌ছিল, ঝুনুর বাবা ওকে

বেশ একটু রোখা কথায়ই জানিয়ে দিলেন,—কি দরকার আপনার বলুন. – আমরা ত' এখেনেই আছি।

জেঠ্‌তুতো দাদা ঝুনুকে শাসালেন, বল্লেন—আমার ঘর থেকে বাঁধানো গীতাখানা নিয়ে আয়, রোজ আমার কাছে পড়া দিতে হবে।

ঝুনু চোখ মুখ রাঙা করে' বল্লে – সে বইখানা ভুল করে' খোকার দুধ গরম করবার সময় পুড়িয়ে ফেলেছি।

বাবা যখন বিদেশে যান, তখন জেঠ্‌তুতো দাদাই ঝুনুর অভিভাবক,—সেই সূত্রেই তাঁর। বলেন—খবরদার যদি মিশিস্ যার তার সঙ্গে। একটা চুনোপুঁটিও না। তারপর লুকিয়ে দেখ শোনা? ইত্যাদি।

খাঁচার পাখী ঝুনু,—বাঙালী গৃহস্থের মেয়ে যেমন হ'তে হয়। সোনালি লতার মতো বাড়তে পেয়েছে,—এই যা, নইলে না আছে বিদ্রোহ, না বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। কাচের বাসনের মতো ঠুনকো,—শুধু গরম চা খাবার জন্য! চুপ করে' বসে' খালি জামা সেলাই করে নানান্ রকমের ছিটের, তসরের, কত কি, কবে দেবে এবং দেবেই বা কি না ভাবে; আর, বিয়ের যে সম্বন্ধগুলি আসে, মনে মনে ওর সঙ্গে মিলায়।

শোবার আগে ঈশ্বরকে ডাকে—উনি যেন ভালো থাকেন ওঁকে আর কষ্ট দিয়ো না, যদি পারেন আমাকে যেন ভুলে' যান একেবারে।

জানলায় বসে দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে,—বহুদূরে পর্য্যন্ত ওর অম্লান শুভেচ্ছাটি পাঠিয়ে দেয়। রাতে শুয়ে ভাবে পাশে এসে উনি শুয়েছেন, আপন মনে আদর করে, মাথাটা তেম্‌নি বুকের মধ্যে চেপে ধরে, কপালের ঘাম মুছে দেয়।

হঠাৎ ব্রহ্মচারী বড়দা একদিন বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠলেন। যেন ক্ষেপে ওঠাই স্বাভাবিক। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে,—জোয়ারের উল্টো টানে একা আর গুণ টানা হ'য়ে উঠবে না।

টাট্টু ঘোড়ার মতো বৌ,—টগবগ করে' ফেরে। মঠবাসিনীর বিলিতি সংস্করণ বুঝি!

চিঠি লিখে একটি ছেলেকে দিয়ে ঝুনু প্রতাপের কাছে পাঠাল।—তাতে লেখা,—তুমি একটিবার এস লক্ষ্মীটি, কতদিন তোমাকে দেখিনি। ভালো আছ ত? আমাকে বুঝি ভুলে গেছ,—একটিবারো দেখতে ইচ্ছা করে না? এসো, অনেক কথা আছে। বড়দা তো নিজে গিয়েই তোমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। এস,—

প্রতাপ গেল—অনেক রাত করে'ই। দু' চারজন চেনা লোকের সঙ্গে মামুলি দু' একটি কথাবার্ত্তা কইল, খেল, বাজে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করতে হ'ল।

ঝুনু চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কত কাজ ওর, সবখানেই ওর দরকার। কি সুন্দর সেজেছে,—বহুদিনকার আগের ঝুনুর সেই চেনা দেহলতা প্রভাতের কাছে অপূর্ব্ব রহস্যময় লাগছিল। নতুন করে' ফের যেন চিনতে চায়। মুখে স্থির ঔদাসীন্যের ভাব,—প্রতাপকে দেখেও একটু কৌতূহল নেই, জিজ্ঞাসা নেই,—দুই মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে চাইবারো যেন ওর সময় নেই। ওকে যেন ঝুনু চেনে না।

একটা আলোতে প্রতাপ আবার সেই চিঠিখানা পড়ল।—এসো, অনেক কথা আছে।

ও কখন ওর অনেক কথা কইবে? সবই কি ধাপ্পা? প্রতাপ ভাবলে,—চলে' যাই, প্রহসন তো পুরাই হ'ল এবার,—এবার পাল গুটোই।

অনেক কথা আছে—তারায় ভরা কালো আকাশও যেন ওকে তাই বলে।

একটা নির্জ্জন ঘর বেছে নীচের তলায় প্রতাপ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গা এলিয়ে বসে' ঘুমিয়েই পড়ে হয়ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যেন ওর অনেক কথা শুন্‌বে। বাড়ি যাবার নামও মনে আসে না আর,—ওর বাড়ি বলে' যেন কিছু নেই।

বরবধূর শুভরাত্রি আজ,—মুখর উৎসব সমাপ্ত হ'য়ে গেছে শুধু একটি গৃহ ছাড়া,—সে গৃহও নিশ্চয়ই আর ব্রহ্মচারীর নয়।

প্রকাণ্ড বাড়িটা তন্ন তন্ন করে' খুঁজে রুণু সেই নীচের ঘরে এল। এসেই মুগ্ধ হ'য়ে গেল,—দুই চোখে জল ডেকে এল,—কি সুন্দর ঐ ঘুমটুকু! ওর ইচ্ছা করছিল একচুমুকে ঐ ঘুমটুকু ও পান করে' ফেলে,—এক চুমুকে এবারের এ জীবন!

রুণু ধীরে ধীরে প্রতাপের কাছে এসে দাঁড়াল,—অন্ধকারে মনে হল ও-ও যেন আর জেগে নেই। ও ধীরে প্রতাপের কপালে ওর হাতখানি রাখলে, জামার বোতামগুলি খুলে বুকের ওপর হাত রাখতেই সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে সেতারের মতো ঝঙ্কার করে' উঠল,—বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অন্ধকারে ও যেন ওর আলাদা অস্তিত্বই ভুলে' গেছে।

প্রতাপের হাতখানি নিজের গালের ওপর রাখল, পরে জামার বোতাম খুলে নিজেরো বুকের ওপর। পরে প্রভাতের দু'টি পা স্পর্শ করে' অনেকক্ষণ প্রণাম করলে।

অথচ জাগাতে পারল না।

বিছানা পেতে ওকে শুতে বল্‌বে ভেবে বিছানা আন্‌তে চলে' যায় ওপরে। ফিরে এসে দেখে প্রভাত ঘরে নেই, উঠে' চলে' গেছে।

দোরের পাশে মেয়েটিকে দেখে প্রতাপ নিশ্চয়ই তা'কে কুন্তু বলে' ভুল করে নি। যদিও সেই সুচারুতা পেলব সর্ব্বাঙ্গে,—যদিও বসে' থাকবার ভঙ্গিটি দুঃখী বিরহিনীরই মতো।

পরিশ্রান্ত জীর্ণ শরীর বিছানার ওপর ঢেলে দিয়ে প্রতাপ খানিকক্ষণ জিরোয়,—মেয়েটি পায়ের কাছে বসে। কত দীর্ঘ দিন আর রাত্রি ও কুন্তুর দু'টি পা দেখে নি, দু'টি কথা শোনে নি,—নারীর নৈকট্যের জন্য ওর সমস্ত দেহ ভুখা, ভিখারী হ'য়ে উঠেছে।

মেয়েটির খস্‌খসে শুক্‌নো বিবর্ণ হাতখানি টেনে এনে ওর কপালে রাখে, পরে জামার বোতাম খুলে' বুকের ওপর।

মেয়েটি এক ফাঁকে উঠে আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসে ফের বসে। প্রতাপের সমস্ত দেহ পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো ঘৃণায় কিল্‌বিল্ করে' ওঠে। জোর করে' বলে—আলোটা বাড়িয়ে দাও, ঐ আলোই তোমার অবগুণ্ঠন।

মেয়েটির সময়ের দাম আছে, তাই বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

প্রতাপ ওর হাত টেনে নিয়ে অবুঝের মতো বলে—বন্ধু সখি—

উঠে চলে' যায়। অন্ধ দোরে দোরে ফেরে,—ঝুমুকে পায় না।

বাড়িতে এসে শোনে,—একটি ছেলে ওর জন্ম অপেক্ষা করে' বসে আছে,—সেই কখন্ থেকে। ফুটফুটে ছেলেটি শুধোয়—আপনিই প্রতাপ-বাবু? আপনার একটি চিঠি আছে।

আলোর সাম্‌নে ধরে' এক নিশ্বাসে ছোট্ট চিঠিটা পড়ে' ফেলে।

—বাইরে তোমাকে খুঁজে' না বেরিয়ে নিজের মধ্যে তোমাকে দেখছি। তোমার শরীর ভালো নেই, এই কেবল আমার মনে ডাক দিচ্ছে। এই ছেলেটির সঙ্গে দুটো লাইন লিখে পাঠিও। আশা করি,—এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে যাও নি। এই সঙ্গে তোমাকে একশোটা টাকা পাঠাচ্ছি,—তুমি নিয়ো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি,—একটুও সঙ্কোচ ক'রো না লক্ষ্মীটি। কেন নেবে না? আমি যে তোমার বন্ধু, পরমাত্মীয়,—তোমার বিপদ অভাব, সমস্ত আমারও। আমার টাকার ত' তা না হ'লে কোনো দামই নেই। নিয়ো,—এম্‌নি ক'রেই তো আমাকে নেওয়া। প্রণাম নিয়ো।

মুখে যা আসে নি, কলমে তা এসেছে। আশায় যা আসে নি তা এসেছে ভালোবাসায়।

ছেলেটি পকেটের থেকে নোটের তাড়া বের করে' প্রতাপের হাতে তুলে দিতে চাইল।

প্রতাপ বল্লে—ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ব'লো, আমি বেশ ভালোই আছি।

ছেলেটি বল্লে—কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পথে পকেট কাটা যাবে, বুলু-দি ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন।

—এত বড় পকেটমার থেকে যখন রেহাই পেলে, আর ভয় নেই!

—না, আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন, যদি ফিরিয়ে আনিস্, তবে তুই একটা আস্ত বোকা। আমি অত বড় অপবাদ সইব না। আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ, টাকা দিলে কেউ আর নেয় না! নিন্।

—বোলো, আমার ওসবের দরকার নেই কিছু। বেশ সুখেই ত' আছি।

—কিন্তু আপনার শরীর ত' খুব খারাপ দেখাচ্ছে, আপনার মা বলছিলেন প্রায়ই জ্বর হয় আপনার।

বুলুর সমস্ত স্নেহ ও করুণা যেন এই সুকুমার ছেলেটির চোখে এসে বাসা বেঁধেছে।

প্রতাপ ছেলেটিকে রাস্তায় অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়,—নানান্ খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে,—সমস্ত দুপুর বুলু-দি কি করেন? নতুন বৌদির সঙ্গে খুব ফুর্তিতেই আছেন নিশ্চয়, দুপুরে আর কেউ বিরক্ত করতে যায় না, ঘুম থেকে কখন ওঠেন, কখন শুতে যান—কবে বিয়ে হবে?

পরে বলে—টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে ওঁকে ব'লো, প্রতাপ-দা তোমাকে ঢের ঢের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ঐ টাকাটা যেন রেখে দেন, প্রতাপ-দা

মরে' গেলে যেন চিতায় ঐ দিয়ে ছোট্ট একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখেন,—কিম্বা যেন আর কোনো সুযোগ্য বন্ধুকে যৌতুক দেন। বল্‌তে পারবে? পারবে না?

ছেলেটি উত্তর দেয়—না। ওসব বুঝি কেউ কাউকে বলে?

*
*
*

বছর ঘুরে' যায়,—দিনের পর রাত পোহায়। যতদিন না পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড বার্দ্ধক্যে ও জরায় অসাড় হ'য়ে যাবে।

আরো বছর ঘোরে।

কেউ কারো বিশেষ কোনো খবর পায় না, চেষ্টাও করে না রাখতে। খালি বেঁচে আছে, এইটুকুই বিশ্বাস করে। বেঁচেই যেন থাকে, যেন অনেক দুঃখভোগ করে,—প্রতাপ মনে মনে এই প্রার্থনা করে; আর ঝুমু মাঝে মাঝে ভাবে,—সুখেই থাকে যেন, আমাকে যেন ভুলে' যায়, —আর ওঁকে কষ্ট দিয়ো না। ভাগ্যের কাছে মূক মিনতি করে।

ঝুমু নিজেকে বোঝাচ্ছে,—কেন বিয়ে করব না? জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, দেদার মাইনে ও প্রতিপত্তি,—জীবনে কত স্বচ্ছন্দতা, কত আরাম, কি সুখশান্তিপূর্ণ বিশ্রাম, গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য,—কি অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি! ওর মনের এই একান্ত মঙ্গলকামনাই কি যথেষ্ট নয়? দুপুরের খররৌদ্রে ফল পাকে বটে, কিন্তু বিকালের অন্তিম মুমূর্ষু মুগ্ধ আলোটির কি কিছু দাম নেই?—ওর বুক টন্‌টন্ করে' ওঠে,—ও ভাবে, প্রথম সন্তান জন্ম হওয়ার পরই বুক শীতল হ'য়ে যাবে। কামনার ধূপে আর ধূম থাক্‌বে না।

অধিবাস

দেহটা শুধু একটা দাম, মাশুল ;—কিন্তু হৃদয় তোমাকে দিলাম,—মাগ্‌না। তোমাকে আমি পূজা করি, তুমি আমার শ্রদ্ধাশ্রু অঞ্জলি নাও। আমার সুখের রাতে তোমার দুঃখের দ্বিপ্রহর বেশি যেন মনে হয়।

এম্‌নি করে'ই বোঝায়। চোখ ঠারে। এম্‌নি করে'ই নদীর বুকে বালুচর জাগে।

অনেকগুলি সম্বন্ধ বাতিল করে' দেবার পর এবার সুপ্ত আ[illegible]া থেকে মত দেয় হঠাৎ। বাবা ও জেঠতুতো দাদা অভাবনীয়রূপে বিস্মিত হ'য়ে সমস্বরে সুখসূচক শব্দ করে' ওঠেন।

বাড়িতে তুমুল তোলপাড় লাগে।

তুমুল তোলপাড় লাগে প্রতাপের হৃদয়েও।

কাঙাল গলিটার পারে এক হিন্দুস্থানি ছেলের বিয়ে হচ্ছে আজ,—দারুণ হল্লা বেধেছে। সব কি অকারণ, শ্রাবণের ঐ বোদা বোবা আকাশ থেকে মাটির এই অর্থহীন নিঃশব্দ বিস্তার!

বাপের বাক্স ভেঙে নিজেরই শেষ মাইনের টাকা দিয়ে কি একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস কিন্‌তে গিয়ে মদের বোতল নিয়ে এসেছিল। আজ রাতে আর তো কোন কাজ নেই,—ভালো ঘুমুনো যাবে।

খেতে পারে না, গলা জ্বলে' যায়। বসে' বসে' ভাবে,—ওর দুটি বোন্ একসঙ্গে বসে' একথালায় ভাত খাচ্ছিল, সে ভাতে রোগের বীজাণু ঢুকল,—পরশু ওর চাকরিটি গেছে। আপিসে নাকি এত বাড়তি

কেরানির দরকার নেই। কেউ কেউ কলম ছেড়ে যেন কুড়ুল হাতে নেয়!

ঘরের এককোণে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর পা মেলে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে প্রতাপ ঘুমিয়েই পড়েছে হয় ত,—ভিজা হাওয়ায় দুর্ব্বল দীপ-শিখাটি হারিয়ে গেছে। মধ্যরাত্রির অতন্দ্র নিস্তব্ধতা।

খোলা দরজা ঠেলে ঘরে কে যেন এল।

তারার অস্পষ্ট আলোতে খানিকক্ষণ সমস্ত ঠাহর করে' নিয়ে ঝুনু ধীরে বাতি জ্বালালে। প্রতাপের কাছে এসে সহজ সুরে বল্লে—ঘুমুচ্ছ? ওঠ, বিছানা পেতে দি, তারপর ভালো করে' শোও।

প্রতাপ চোখ কচ্লে জেগে ওঠে—

ঝুনু বলে—ওরকম হাঁ হয়ে গেছ কেন? ভালো করে' শোও—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

সর্ব্বাঙ্গে নববধুর অপূর্ব্ব অনিন্দ্য বিলাসসজ্জা,—মুকুলিত যৌবন রসসিঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

প্রতাপ বলে—আজ তোমার বিয়ে না?

লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলে—হ্যাঁ—

—হয়ে গেছে?—হয় নি এখনো?

—এই ত' হ'চ্ছে। নাও, ওঠ,—তোমার গায়ে বেশ জ্বর আছে কিন্তু। কি খেয়েছ? শোন, তোমার কাছে এম্নি কোন কাপড় আছে পরবার? দাও না, এগুলি ছাড়ি।

হাওয়ায় আবার বাতি নিবে যায়। জ্বালানো হয় না আর। মেঘের আড়াল থেকে ক্ষীণ ও ক্ষণিক তারার আলো ঝিকিমিকি করে।

ঝুনু বল্লে—ছোট জেঠতুতো ভাই,—পানু যে একদিন তোমার খবর নিতে এসেছিল, তারই সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—আবার কখন যাবে ?

—এইখেনেই থাকব। এই কথা ঝুনু বল্‌তে পারলে না। আবার যাবার কথা কেনই বা প্রতাপ জিজ্ঞাসা কর্‌ল ? ওর ঐ ব্যাকুল বাহু দিয়ে ওকে বন্দী করে' রেখে দিতে পারে না ?

পারে না।

ঝুনু বলে—পানু ভোর বেলা দাদাকে বল্‌বে চুপি চুপি, দাদা আমাকে নিয়ে যাবেন। দাদা দিন তিনেক হ'ল ফিরে' এসেছেন জান না বুঝি ? দাদা ছাড়া আমাকে অপমান থেকে বাঁচাবার কেউ নেই।

—আমি আছি। জোর করে' বুক ফুলিয়ে প্রতাপ বল্‌তে পারলে না।

খালি বল্লে—দাদার সঙ্গে কোথায় যাবে ?

—ইস্কুলের একটা টিচারি পেয়েছি। বা রে, ওঠ, বিছানা পেতে দিই। আমারো ঘুম পাচ্ছে খুব।

—কি হবে বিছানা পেতে ? ঘুম যদি পেয়েই থাকে নেহাৎ, এখানে এলে কেন তবে ? এখানে কেউই ঘুমায় না, এই নিয়ম। কত মাইনে পাবে ?

—আপাতত তোমার সমান।

প্রতাপ বল্‌তে চায়—আমার চাকরি গেছে। ভাবে কি হবে বলে' ? হয় ত বা টাকা পাঠিয়ে দেবে।

ঝুনু বল্লে—তোমার কাপড় দিলে না ?

—না। এই তুমি,—যদিও ইস্কুল-টিচারের মতো দেখাচ্ছে না। আচ্ছা, আজ রাতে একটা উৎসব করলে হয় না?

বুঞ্চু উৎফুল্ল হ'য়ে বল্লে—খুব চমৎকার হয়। কিন্তু তা'র আগে তোমাকে কিছু খাইয়ে নিলে ভাল হ'ত। রান্নাঘর কোথায়, আমাকে দেখিয়ে দাও,—দুধ আছে? উনুন ধরিয়ে একটু দুধ জাল্ দিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু কি উৎসব করব?

—আমি তোমার বুকের কাছে শুয়ে মরে' যাব,—আর তুমি উলু দেবে।

ম্লানমুখী বুঞ্চু প্রতাপের হাতখানি নিজের কোলের ওপর টেনে নেয়, বলে—তুমিই দিয়ো।

আর কেউ কোনো কথা কয় না, হাতের মধ্যে হাত রেখে চুপ করে' বসে' থাকে।

সেই ট্রেনের রাত্রির কথা মনে পড়ে,—এই ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী হঠাৎ কক্ষচ্যুত হ'য়ে গেছে, চোখের জলবিন্দুর মতো তারারা খসে' পড়ছে, সূর্য্য ফাটা তুবড়ির মতো নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে, মৃত্যু উলঙ্গ হ'য়ে গেছে,—শুধু ওদের হাতের ওপর হাত,—যেন সৃষ্টির আদিকাল ও অন্তিমকাল পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

তিথি পূর্ণিমা বটে, কিন্তু মেঘাবগুণ্ঠিত।

প্রতাপের ইচ্ছা করে বুঞ্চুর ঐ মুখ, উত্তপ্ত বক্ষঃস্থল, বসনান্তরালের সমগ্র দেহের প্রতি রোমকূপ অজস্র মদির চুম্বনে পাণ্ডু করে' দেয়,—বুঞ্চুর ইচ্ছা করে রথের চাকার তলে মাটির ঢেলার মতো নিজের অস্তিত্বটা প্রতাপের বুকের তলায় গুঁড়া করে' ফেলে।

কেউই নড়ে না, শুধু তেমনি হাতের ওপর হাত মেলে রাখে। যেন সৃষ্টির আগের ও পরের দুই অপরিমেয় নিঃশব্দতার মহাসমুদ্র!

তারপর ভোর হয়। ঝুনু হঠাৎ বলে—ঐ দাদা এসেছেন, আমি যাই।

প্রতাপ কোন কথা কয় না। দোর খুলে' ঝুনু ধীরে ধীরে চলে' যায়।

পুনর্মিলন

ক

একদিন অণু আসিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। শীতের বেলা; দেরি করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া কুমুদ শব্দ করিয়া চা খাইতেছিল, হঠাৎ অণু কোথা হইতে সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

কবি কীট্‌সের প্রণয়িনী ফ্যানি যখন ঘরে ঢুকিত তখন তাহাকে নাকি কবির চোখে ব্যাঘ্রীর মতই ভয়ঙ্কর সুন্দর মনে হইত; কুমুদ কবি নয়, তবুও একেবারেই আশা না করিয়া সহসা চোখের সামনে এতদিন বাদে অণুকে সশরীরে আবির্ভূত দেখিয়া সে পলক ফেলিতে পর্যন্ত সাহস পাইল না। কুজ্ঝটিকার মত প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ত' নয়ই, মনে হইল অণু যেন স্থির চাঞ্চল্যহীন একটা ঝটিকা—এখুনিই সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে।

হইলও তাহাই। হাত হইতে বাইশ-ইঞ্চির স্যুট্‌কেশটা মেঝের উপর ফেলিয়া অণু কহিয়া উঠিল,—চলে' এলাম কুমুদ-দা, আস্‌চি গোগাটি থেকে। শাস্তাহারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ষ্টেশন-মাষ্টার জাগিয়ে দিলেন শেষে।

শিলঙ-মেল ধরতে পারলুম না। সে ভারি মজাই হ'ল। বৌদি কোথায়? তুমি বিয়ে করলে শেষ কালটায়?

চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিতে গিয়া খানিকটা চা টেবিলের সবুজ বনাতের উপর চল্‌কাইয়া পড়িল; ডলিকে ডাকিয়া নেবু কাটাইয়া তাহার উপর ঘষিয়া-ঘষিয়া রঙটা ফিকা করিয়া তোলা যাইবে কি না কুমুদ সেই মুহূর্ত্তে তাহাই ভাবিয়া লইতেছিল, অণু আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া হাঁকিল,—চিনতে পাচ্ছ ত' আমাকে? বৌদিকে ডাক। তোমাদের বাড়িতে আজ আমি অতিথি।

কুমুদ কথা কহিতে পারিল,—গরিবের ঘরে তোমার পদার্পণ! কী মনে করে' হঠাৎ?

অণু কহিল,—মাষ্টারি ছেড়ে দিলুম; যাচ্ছি দিল্লি। রেলোয়ে-বোর্ডে একটা মেয়ে-অফিসারের পোষ্ট খালি হয়েছে। দরখাস্ত করতেই কপালে লেগে গেল। মাইনে ত' বেশি-ই, তা ছাড়া ফ্রি ট্রাভলিঙ। কোথায় পেশোয়ার, কোথায় বা ডিব্রুগড়! বাবার তত মত ছিল না বটে, শেষ-কালে রাজি না হয়ে পারলেন না কিন্তু।

কুমুদ শুধু আস্তে কহিল,—কন্‌গ্রেচুলেশান্‌স্।

—ভাবলুম দিল্লির মুখে কল্‌কাতায় দিন কতক থেকে যাব। হোটেল ছিল বটে, কিন্তু তোমার কথা ভারি মনে পড়ছিল। কতদিন পরে দেখা বল ত'? প্রায় সাড়ে তিন বছর? বি-এতে আমরা দু'জন ব্র্যাকেটে নাইন্‌টিন্‌থ্‌ হয়েছিলুম—এমন সচরাচর হয় না। ডাক না বৌদিকে। আমার সাম্‌নে বৌকে নাম ধরে' ডাক্‌তে লজ্জা করছে বুঝি!

অধিবাস

পাশের একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া কুমুদ কহিল—বোস। ভগ্নি এখুনি আসবে। নীচে তরকারি কুটছে হয় ত'।

চেয়ারে বসিবার আগে অণু তাহার গা হইতে পাৎলা ছাই-রঙের শালখানা নামাইয়া রাখিল—যেন কুয়াসার আবরণ সরাইয়া আকাশ নির্ম্মল, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বসিয়া কহিল,—আমার কিন্তু ভারি খিদে পেয়েছে, কুমুদ-দা। ট্রেন মিস্ করেছি শুনে পাশ বদ্‌লে ভালো করে' ঘুমিয়ে নিলুম শুধু। তারপর খাওয়ার আর সময় হ'ল না। বৌ'দকে বলে' এস আমারো জন্যে তরকারি চাই। চা'ল দেড় বাটি নিতে ব'লো। —আমি কিন্তু বেশ খেতে পারি।

সামান্য কৌতুক বোধ করিয়া কুমুদ কহিল,—ন'টার সময়েই রোজ আমার আপিসের বেলা হয় কি না—তাই এই সকাল থেকেই রান্নার সরঞ্জাম হচ্ছে। তোমাকে দেখে ভারি খুসি লাগছে, অণিমা। নাম ধরে' ডাকলুম—

হাসিতে ঈষৎ একটু ইঙ্গিত করিয়া অণু বলিল,—অণু বলে' ডাকা উচিত ছিল। তা হ'লে আরো খুসি হ'তুম।

কথোপকথনটা হঠাৎ থামিয়া গেল দেখিয়া এই ক্ষণস্থায়ী স্তব্ধতাটা অতিমাত্রায় অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। তাই অণুই আবার প্রশ্ন করিল,—বিয়ে করেছ কত দিন?

বুঝিল, প্রশ্নটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে নষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই।

অল্প একটু হাসিয়া কুমুদ কহিল,—প্রায় সাত মাস পুরো হ'য়ে এল।

এইবার কথায় মোড় ফিরিয়াছে। আর অসাবধান হইবে না ভাবিয়া এইবার অণু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কহিল,—আছ বেশ?

এই প্রশ্নটাও এমন হইল যে, যেন ইহার উত্তরে একটা শ্লেষাত্মক বা অসন্তোষজনক কোনো কথা পাইলে অনু খুসি হয়। সে প্রত্যাশাও করিয়াছিল তাহাই। বিবাহের অন্তরালে যে একটি অনাবিষ্করণীয় রহস্য থাকে তাহার মোহভঙ্গ ঘটিতে সভ্য মানুষের পক্ষে এক মাসের অবারিত সান্নিধ্যই যথেষ্ট। তাহার পর যাহা থাকে তাহা সাংসারিক সুবিধার জন্য দৈহিক একটা নৈকট্যমাত্র। এই চেতনা হইতে মনে স্বভাবতই যে একটা হতাশা বা অতৃপ্তির ছায়া পড়ে তাহারই একটা আভাস কুমুদের কথায় পাইবে বলিয়া অনু ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কুমুদ যাহা বলিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

কুমুদ কহিল,—সত্যিই খুব ভালো আছি।

পরিপূর্ণ, সুস্পষ্ট উত্তর—অনুর আশঙ্কাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই যেন কুমুদ ঐ ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে এতখানি আবেগ ঢালিয়া দিয়াছে। অতএব বাধ্য হইয়াই তাহাকে সায় দিতে হইল—সুন্দর বাড়িটি কিন্তু। দু'জনের পক্ষে আইডিয়েল্। কত ভাড়া?

—বিয়াল্লিশ।

—মাইনে কত পাও? জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক হ'ল না মনে করো না। তোমার সব কথা আমার এত জান্‌তে ইচ্ছে করে।

—না, না। মাইনে যদিও বেশি নয়, বল্‌তে আমার লজ্জা নেই। একশো টাকা। আমার ভাগ্য বলতে হ'বে। সুবোধকে চিনতে ত'? সেই যে হিস্‌ট্রিতে সেকেণ্ড হয়েছিলো—বেহারের এক সাব্‌ডিভিসনে মাষ্টারি করে' মোটেই পঁয়ত্রিশ টাকা পায়! পাশ করে' বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিল। তিন বছরে পণের নগদ টাকা বা দান-সামগ্রীর

চিহ্নও নেই—অথচ দুটি শিশু আছে। কী কষ্টে যে আছে। কিন্তু বউটি ওর সত্যিই সোনার টুকরো মেয়ে—সেই ওর সান্ত্বনা। আমি যে গিয়েছিলুম ওর কাছে একবার।

এত সব দারিদ্র্য ও অভাবের বর্ণনা এমন তৃপ্তিসহকারে দেওয়া যায় ইহা অণু কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। নিদারুণ নিরানন্দতার মাঝে কতগুলি নির্দোষ শিশু আহ্বান করিয়া তাহাদের ভয়াবহ লাঞ্ছনাকে কুমুদ পরোক্ষে সমর্থন করিতেছে ভাবিয়া তাহার উপর অণুর রাগ হইল। কহিল,—দারিদ্র্য একটা নিদারুণ অপরাধ, যখন সে দারিদ্র্য আমরা জোর করে' অন্যের উপর আরোপিত করতে চাই।

ইঙ্গিতের প্রাখর্যটুকু ধরিতে কুমুদের দেরি হইল না। কহিল,—জানি সুবোধকে সহানুভূতি করবার অধিকার নেই, কেননা আমিও একদিন হয়ত তার চেয়েও নীচে ডুবে যাব। তবুও এই ভরসা রাখতে এখনো বল পাই যে ডলি আমার চিরকালের আশ্রয়স্থল হ'য়ে থাকবে।

একটু থামিয়াই তাড়াতাড়ি কুমুদ কথাটাকে পাল্টাইল—ডলিকে ডাকি। ওকে নেপথ্যে রেখে তোমার প্রতি আতিথ্য দেখানোর কোনো মানে নেই।

ডলিকে ডাকিতে যাইবে অণু বাধা দিল, বলিল,—তুমি আজ আপিস যেতে পারবে না।

কুমুদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কেন বল ত?

—আমার সঙ্গে দুপুরে তোমার বেরুতে হ'বে। অনেক কেনাকাটা করতে হ'বে—তা ছাড়া বিকেলে একবার বেলুড় যেতে হ'বে সেখানে আমেরিকা থেকে একটি টুরিষ্ট এসেছেন—মিষ্টার হেইলি—তাঁর সঙ্গে

আমার দিল্লি যাবার আগে দেখা করা চাই। কালকে সময় হ'বে না, কালকে সন্ধ্যায় নিউ-এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে যাব।

কুমুদ ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া অণু অসহিষ্ণু হইয়া কহিল,—একদিন আপিস কামাই করলে তোমার একশোর এক-টা মিলিয়ে যাবে না নিশ্চয়। (মোহমাখা স্বরে) কত দিন পরে দেখা বল ত? পুরোনো বন্ধুর জন্যে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করলে তোমার জাত যাবে না।

কুমুদ স্বচ্ছন্দে কহিল—বেশ, যাব না আজ আপিস। কিন্তু ডলিকে তা হলে বলা দরকার।

দরকার ছিল না, ডলি নিজে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমত ঘুম হইতে উঠিতেই প্রচুর আলস্য, তাহার পর স্নানাহার সারিয়া তাড়াতাড়ি যে আফিসে যাইতে হইবে সে-কথা পর্য্যন্ত বেমালুম ভুলিয়া গিয়া হয়ত আরেক কিস্তি ঝিমাইতেন—সেই বিষয়ে স্বামীকে সচেতন করিতে ডলি তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে নিমেষে তাহার সকল বুদ্ধি গুলাইয়া উঠিল। পাশাপাশি দুইটি চেয়ারে বসিয়া স্বামী ও আরেকটি যুবতী বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া কথা কহিতেছেন। ডলি চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করিয়া অণুর ললাট, সীমন্ত ও পদপ্রান্ত দেখিয়া লইল—তাহাতে কোথাও একটু অনুরঞ্জনের চিহ্ন নাই। ব্যাপারটা তাহার কাছে সুবিধার মনে হইল না; হঠাৎ সে যেন একটা মূক-লোকে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, কেন না তাহার আসার আভাস পাইয়াই তাঁহারা সচকিত

হইয়া থামিয়া পড়িয়াছেন। যেই কথাটা বলা হইতেছিল ডলির নিকটবর্ত্তিতায় তাহা অসমাপ্ত রাখা যেন সমীচীন হইবে।

অণুকে অবশ্য বলিয়া দিতে হইল না, তবু এই একরত্তি মেয়েটিকে বৌদি বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে তাহার হাত উঠিল না। ছয়ছোট্ট মানুষটি, মুখে চোখে গৃহপালিত পশুর মত একটা নিরীহ ভাব,—অণুকে দেখিয়া নিমেষে সঙ্কুচিত ব্রীড়াময়ী হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অণু কুমুদের রুচিকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতে পারিল কৈ? এত অল্প বয়সের খুকিকে লইয়া সে কী করিবে? মেয়েটি বোধহয় ম্যাট্রিকটাও পাশ করে নাই—বিলেতে যে এই বৎসর আবার গোলটেবিলের বৈঠক বসিবে তাহার খবরটুকুও হয়ত রাখে না, কিং আর্থারএর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—তবু এমন একটি সাদাসিধে আটপৌরে বউ নিয়া কুমুদ দিব্যি গদ্‌গদ হইয়া বলিয়া ফেলিল যে সে তোফা আছে! ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে স্পেন্সারের এ-মত খণ্ডন করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

এই অশোভন অবস্থাটা কুমুদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিল না। চেয়ার হইতে উঠিয়া অণুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—চিন্‌তেই ত' পাচ্ছ আর (ডলির প্রতি) ইনি আমার কলেজের বন্ধু—এক সঙ্গে বি. এ পাশ করেছি। হঠাৎ আজ আমাদের এখানে অতিথি হয়েছেন।

ডলির মুখের বিস্মিত ভাবটা দেখিয়া অণু বিরক্ত হইল; বুঝাইয়া দিল—আমরা স্কটিশ-এ পড়্‌তুম। পুরো চার বছর। তার পর ছাড়াছাড়ি। তিন বছরের ওপর। তুমি বুঝ্‌তে পারলে না? স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। তুমি চম্‌কে উঠ্‌ছ যে। হি হি হি।

(কুমুদের প্রতি) জান, কল্যাণী সিটিতে পড়ত, সেখানে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় অসুবিধে ছিল বলে' তার আপশোষের শেষ ছিল না। সরস্বতী পূজো নিয়ে যে গোলমাল চল্‌ছিল সেই ওজুহাতে কল্যাণী স্কটিশ-এ এসে ভর্ত্তি হ'ল। বন্ধু জুটল প্রেফেসার। এমন ছ্যাবলা প্রোফেসার তুমি আর দেখেছ ?

এই সব তুচ্ছ কথাবার্ত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডলি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি আজ আপিস যাবে না ? ঘড়িটা যে রোজ স্লো যায় তা তুমি রোজই ভুলে যাবে নাকি ?

অণু বুঝিয়াছিল তাহার আসাতে এই নবপদস্থা গৃহিণীটি অতিমাত্রায় আপ্যায়িত হয় নাই, তাহা ছাড়া অতিথি-সমাগমের উপলক্ষ্যে কতটুকু শিষ্টাচারিণী হইতে হয় তাহাও সে শিখিয়া রাখিতে ভুলিয়াছে,—কিন্তু এই খুকির ব্যবহারে সে অপমানিত হইবে, অণু এতটা অভিমানিনী নয়। তাহার রসনা প্রখর, মেরুদণ্ড শক্তিশালী। তাই কথায় অবজ্ঞা মিশাইয়া সে কহিল,—কুমুদ আজ আমাকে নিয়ে একটু ঘুরবেন। আজকে আপিস কামাই করতেই হ'বে। তাড়াহুড়ো করে' লাভ নেই।

ঐ ভাষাটাকেই স্নিগ্ধ করিয়া কুমুদ বলিল—উনি দিল্লি যাবেন—পথে এখানে একদিন জিরোবেন। তুমি ওঁর জন্যেও রান্নার জোগাড় কোরো। কানাইকে বাজারে পাঠাও।

ডলি কহিল,—কানাই পোষ্টাপিসে গেছে। তুমিই বরং বাজারটা ঘুরে এস।

কুমুদ খুসি হইয়া বলিল,—আচ্ছা, তাই বেশ। তোমরা ততক্ষণ গল্প কর। ঘরে খুব সম্ভ্রান্ত অতিথি এসেছেন, তাঁর যেন অযত্ন না হয়, ডলি।

কুমুদকে নিরস্ত করিতে গিয়া অণু তাহার হাতটাই একটু ছুঁইয়া ফেলিল,—তাহা ডলির দৃষ্টি এড়াইল না। কুমুদ চলিয়া গেলে এই গ্রাম্য মেয়েটাকে লইয়া সে কী করিবে—মনের মত করিয়া একটাও কথা বলা যাইবে না! সে কি এই মেয়েটার সঙ্গে বাজার-দর বা ব্লাউজের প্যাটার্ণ লইয়া তর্ক করিতে টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়াছে নাকি! একটা শাড়ি পরিয়াছে—মশলা আর ময়লায় মাখামাখি! বাড়িতে কেহ অভ্যাগত আসিলে তাহার সম্মুখে আসিবার সময় যে শাড়িটা বদলাইয়া লইতে হয় এই সামান্য সুরুচিটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই। অঙ্গসৌষ্ঠবেও যদি মেয়েটা সমৃদ্ধিশালিনী হইত তবুও না হয় কুমুদের পৌরুষ-গর্ব্বকে ক্ষমা করা যাইত। সময়ের মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর অবিবেচনা থাকিলে এই জাতীয় মেয়েকে লইয়া রাত্রির পর রাত্রির অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অকাতরে অপব্যয় করা যায় তাহা বুঝিয়া কুমুদের প্রতি তাহার করুণার অন্ত রহিল না। এ মেয়েই নাকি কুমুদের চিরকালের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকিবে! এমন দ্রুত নৈতিক অধঃপতনের কথা কোথাও পড়িয়াছে বলিয়া অণুর মনে হইল না।

—একটা দিন, বাজার যেতে হবে না তোমাকে। কত দিন পরে দেখা। কত গল্প বাকি পড়ে' আছে। (ডলির প্রতি) তুমি যাও, কানাই এলে তাকেই পাঠিয়ো। তাড়া ত' নেই কিছু।

ডলি স্বামীর চেয়ারটার আরো সমীপবর্ত্তী হইল, স্বামীর বন্ধুনীর কথায় সে ঘর ছাড়িয়া যাইবে? কিন্তু স্বামীও যখন কহিলেন—অণুর জন্যে চা করে' নিয়ে এস, তখন স্বামীও তাহাকে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিতেছেন ভাবিয়া সহসা ডলির পায়ের নীচে সমস্ত মেঝেটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। গম্ভীর অভিমানে মুখখানা ম্লানতর করিয়া টেবিলের

উপর হইতে চায়ের বাটিটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চৌবাচ্চার সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকু লইয়া যে একটি ছোট বাথরুম বানানো হইয়াছে তাহারই দুয়ারে, স্নান করিতে যাইবার সময় অণুর সঙ্গে ডলির একান্তে দেখা হইয়া গেল। পরম শত্রুতা না থাকিলে সেইখানে একটাও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকা মানুষের সাধ্য নয়; তাই অণু একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল,—তুমি কদ্দুর পড়েছ?

নিতান্তই ডলির শিক্ষাভিমান ছিল না বলিয়া এমন একটা প্রশ্নের উত্তরে কিছুই শ্লেষ বাক্য না বলিয়া সোজা উত্তর দিল—বানান্ না করে' কিছু-কিছু পড়তে পারি। ও-সব বিষয়ে মা'র একেবারেই ঝোঁক ছিল না, নিজ হাতে রাঁধতে শিখিয়েছেন খালি। বল্‌তেন, রান্নার চেয়ে উঁচুদরের কারুবিদ্যা মেয়েদের আর কিছু শেখবার নেই।

অণু যে নেহাৎই শিক্ষয়িত্রী তাহা তাহার নীচের কথাগুলি হইতে বুঝা গেল। বলিবার সময় বাম ভ্রুটিও সে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা বাসন মাজিতে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া তাহা ডলির চোখে পড়িল না।

—বল কি? খালি রান্না! লেখাপড়া না শিখে একটুও না বেড়ে জড়-পুটুলি হ'য়ে বসে' থাকলে স্বামীর কাছে যে দু'দিনে ফুরিয়ে যাবে! যার বুদ্ধি নেই, তার প্রাণও নেই!

বক্তৃতাটা আরও দীর্ঘকায় হইত, কিন্তু ডলি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া সোজা উপরে আসিয়া কুমুদের হাত হইতে শেইভিং ব্রাশটা কাড়িয়া লইল। বলিল,—তোমার আজ বেরুনো চল্‌বে না।

কুমুদ চমকিয়া কহিল—তার মানে ?

—মানে একটুও অস্পষ্ট নয়। মিথ্যেমিথ্যি আপিস কামাই করলে। বরং দুপুরে আজ ঘুমোও।

কুমুদের উদ্বেগ বাড়িল। ঢোঁক গিলিয়া কহিল—কি হয়েছে বল ত ?

ডলি একটুও লুকোচাপা করিল না—স্বামীর সঙ্গে মোটেই তাহার সেই সম্পর্ক নয়। স্বামীর চুলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া সে কহিল—ওঁর কথাবার্ত্তা আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না, চালচলন ত দস্তুরমতো চোখে ঠেকে। কে উনি তোমার, যে এক কথায় আপিস কামাই করলে ?

কুমুদের বুঝিতে দেরি হইল না, কিন্তু ডলির এই সন্দিগ্ধ কথাগুলিতে তাহার সঙ্কীর্ণচিত্ততার আভাস পাইয়া সে মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কহিল—তুমি তাকে অপমান করেছ বুঝি ? খবরদার ডলি।

ডলি একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। স্বামী তাহাকে তিরস্কার করিলেন তাহাতে তাহার দুঃখ ছিল না, কিন্তু সেই তিরস্কার করিবার প্রচ্ছন্ন হেতুটা তাহার চোখে এমন বিসদৃশ হইয়া দেখা দিল যে, সে নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না ; চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া বহু কষ্টে মুখ হইতে বস্ত্রাঞ্চল সরাইয়া তাহার গালে অনেকগুলি চুমা খাইয়া ফেলিল।

সামনেই আয়নাটা খোলা ছিল—তাহাতে নিজের মুখের চেহারা দেখিয়া ডলি না হাসিয়া আর থাকিতে পারিল না।

খ

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়।

স্বামী তাহাকেও তাঁহাদের সঙ্গে খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু খাইবার পর তাঁহার অনুচারিণী হইয়া বাহির হইবার অধিকার ত তাহার নাই। অন্যদিন স্বামীর সঙ্গেই সে স্নান সারিয়া লইত, তিনি আপিসের জামা-কাপড় পরিতে উপরে গেলে তাঁহার পরিত্যক্ত থালাতেই সে ভাত বাড়িয়া খাইতে সুরু করিত—কতদিন সেই এঁটো মুখেই তিনি নীচু হইয়া চুমা খাইয়া পরে আবার জলের গ্লাশটায় এক চুমুক দিয়া বারে বারে পিছন তাকাইতে তাকাইতে বারান্দাটুকু পার হইয়া যাইতেন। আজ তাহার কিছুই হইল না। একটা দিনও পুরা নয়—অথচ সব যেন কেমন অন্যরকম হইয়া গেছে। দশটা বাজে—অথচ এখনো তাহার স্নান হয় নাই; ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার নিজেরই যেন সহিতেছিল না।

রান্নাঘরে ডলি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া হেঁট হইয়া যেন নিজের লজ্জা লুকাইতেছে। উনুনটা তখনো জ্বলিতেছিল—জ্বলুক। কয়লা বাঁচাইতে তাহার ইচ্ছা নাই। বেরালটা যে বাটি হইতে একটা মাছ লইয়া উধাও হইল, তাহা জলজ্যান্ত দুইটা চক্ষু দিয়া দেখিয়াও তাহার হাত

উঠিল না। কানাই আসিয়া যে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার চুল ছাটিবার জন্য পয়সা চাহিয়েছে, সে-কথায় কান পরে দিলেও চলিবে।

ডলির দুঃখের আজ আর পার নাই। স্বামীর কাছে সত্যই সে ফুরাইয়া গিয়াছে বুঝি। সে না চটুল, না বা প্রগল্‌ভ। তাহার না আছে বিভ্রম, না বা লীলা! সে নেহাৎই বাক্স, সীমাবদ্ধ—একেবারেই নিজেকে সে ধরা দিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে তাঁহার আর নিশ্চয়ই ভাল লাগে না। সামান্য শাড়ি পরিবার বা খোঁপা বাঁধিবার সুচারু কৌশলটুকু পর্য্যন্ত তাহার জানা নাই—সে বোকার মত কপালের উপর প্রকাণ্ড একটা গোল করিয়া সিন্দুর পরে বলিয়াই স্বামীই কতদিন ঠাট্টা করিয়াছেন। তাই আজ বিধিদত্ত বন্ধু পাইয়া তিনি হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন আর কি! আপিস করিবার কথা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে রহিল না।

সেইবার পূজার আগে ডলির ডেঙ্গু হইয়াছিল—সে কী জ্বর, সমস্ত গায়ে অসহ্য ব্যথা। ডলির ভারি ইচ্ছা হইতেছিল স্বামী সমস্তদিন কাছে বসিয়া থাকেন। যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকিবে ততক্ষন আদর করিবেন, ঘুমাইয়া পড়িলে গায়ের খুব কাছে ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া না-হয় বই পড়িবেন। মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস হয় নাই—তিনি সেদিন রোগী সেবার খাতিরে তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তাহাকে হয় ত' আজিকার তুলনায় সুখী-ই করিয়াছিলেন। আজ কত অনায়াসে দিব্যি পান চিবাইতে-চিবাইতে বাহির হইয়া পড়িলেন,—আপিস আজ সহসা বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা ডলি কবে ভাবিতে পারিয়াছিল। একবার তাহার ছোটকাকা চিকিৎসা করাইতে কলিকাতা আসিলে স্বামী তাঁহার সঙ্গে দেখা করাইবার জন্য তাহাকে বাগবাজারে নিয়া গিয়াছিলেন।

বাস্-এ উঠিয়া অভ্যাসবশত ঘোম্টা টানিয়া দিয়াছিল বলিয়া চাপা গলায় স্বামীর সেই তিরস্কার সে ভোলে নাই। নতুবা, কোথায় বা বেলুড়, কোথায় বা মার্কেট, কোথায় বা ষ্টার থিয়েটার—কিছুই সে খবর রাখে না। স্বামী আপিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া চা খাইয়া দাবা খেলিতে বাহির হইতেন, ডলি ঘরে বসিয়া পরের দিনের জন্য স্বামীর জুতায় কালি লাগাইত, জানালার পর্দা সেলাই করিত, কখনো বা স্বামী গায়ে ঠেলা দিয়া জাগাইবেন আশা করিয়া মিছামিছি বিছানার উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিত।

রান্নাঘরে এঁটো বাসন-পত্রের মধ্যখানে ডলি চিত্রার্পিতের মত নির্ব্বাক্, স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কোনো কাজেই তাহার হাত উঠিতেছে না। চাকরটা পয়সার জন্য তাড়া দিয়া কখন অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার খেয়াল নাই। এগারোটা বাজিলেই যে সকালবেলার টিউশানিগুলো সারিয়া ঠাকুরপো আসিয়া ভাত চাহিবেন, সে-বিষয়েও তাহার মনোযোগ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে ইহা একবার অনুভব করিয়া সে আর বারিধারাকে নিবারণ করিতে পারিল না।

গ

রাস্তায় নামিয়াই অনুর অনুরোধে ট্যাক্সি লইতে হইল। ঠিক হইল, মিউজিয়ামে নতুন বাঙালি শিল্পীর যে-সব ছবি প্রদর্শিত হইতেছে, প্রথমে সেগুলির রসসন্ধান করিতে হইবে, পরে দুইটার সময় বিশেষ-অভিনয়

উপলক্ষে থিয়েটারে যে একটা নতুন নাচের প্রবর্ত্তন হইয়াছে সেইখানে তাহা দেখিয়া অজন্তা-গুহার চিত্রাবলীর সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে—বেশিক্ষণ থাকা পোষাইবে না। পিপাসা পাইলে কোথাও নামিয়া কিছু আইস্-ক্রিম খাওয়া যাইবে, তাহার পর গড়িমসি করিয়া বড়বাজার ষ্টিমার-ঘাটে গিয়া সন্ধ্যার ষ্টিমারে বেলুড়মঠে যাওয়া যাইবে'খন। ফিরিবার তাড়া নাই, খানিকদূর হাঁটিয়া আসিলেই বাস্ পাওয়া যায়—তা ছাড়া গঙ্গায় নৌকা ত' আছেই!

রাত্রি আটটার সময় নৌকা করিয়া কুমুদ আর অণু বাড়ি ফিরিতেছিল।

নিয়মের অতিরিক্ত এই অস্বাভাবিক জীবনের মাদকতায় কুমুদ বিভোর হইয়া পড়িয়াছে—এই দিনটি সে বাঁচিতে পারিল ভাবিয়া সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছে না। অণু যেন আবার তাহার পুরাতন যৌবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে তপ্ত উজ্জ্বল দেহে, মদিরারক্ত মোহময় চক্ষু দুইটিতে! সমস্ত সংসারে সে অণুর জন্য একটুও স্থান করিয়া রাখে নাই!

যে-সন্দেহটা সমস্ত দিন ধরিয়া সঙ্গোপনে অণুকে পীড়া দিতেছিল তাহা গঙ্গার উপরে এই নীরব মুহূর্ত্তে আবার উচ্চারিত হইল। যেন কাতরকণ্ঠে সে আবার প্রশ্ন করিল,—বিয়ে করে' সত্যিই ভাল আছ, কুমুদ?

আগের কথার সঙ্গে এই প্রশ্নটা পারম্পর্য্য রক্ষা করে নাই বলিয়া

ইহার অন্তরালের প্রচ্ছন্ন বিষাদটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এইবার কুমুদকে আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিতে হইল—তেমন কি আর ভাল আছি? কোনোরকমে নিঃশ্বাস নিচ্ছি মাত্র।

এইবার এই বিশ্বাস করিতে কুমুদ তাহার বিবেকের সম্পূর্ণ সায় পাইল যে, সত্যিই সে ভাল নাই। সে এতদিন একটা কঠোর ও কৃত্রিম নিয়মের দাসত্ব করিয়াছে, স্ত্রীকে ভাল না বাসিলে সংসারে সর্বতোমুখী অসুবিধা ঘটে—তাহার জন্যই সে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে অকৃপণ ছিল—এবং এখন তাহার মনে হইতে লাগিল স্ত্রীর সাহচর্য্যে সত্যই সে দিনে-দিনে দরিদ্রতর হইতেছে। তাহার যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সব এখন নিঃশেষিত, নিজেকে নূতন করিয়া দান করিবার তার তাগিদ নাই বলিয়া নূতন করিয়া নিজেকে অর্জ্জন করিবার অনুপ্রেরণাও আর নাই। বস্ত্র দিয়া যেমন দৈহিক নগ্নতা নিবারিত হয়, যেন তেমনি করিয়াই স্ত্রীর প্রেমে সে তাহার চরিত্র রক্ষা করিতেছে। এই খুঁতখুঁতে চরিত্রের মূল্য কিছু আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

তাই সকালে যাহা বলিয়াছিল সন্ধ্যায় কুমুদ তাহার উল্টা কথা বলিয়া বসিল। কহিল,—একলা থাকার মত জীবনের বড়ো ঐশ্বর্য্য সত্যিই কিছু আর নেই, অণু। আমরা বড়ো সহজে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ি—তার পর বিয়ে নামক নেশা না করলে আমরা আর টিকতে পারি না। দিন কয়েকের জন্য স্নায়ুগুলো খুব সতেজ এবং রক্ত খুব গাঢ় তপ্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রত্যেক নেশার অবসানে যে অবসাদ আসে তার মতো অস্বাস্থ্য আর কি আছে?

অণু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—এই ত' দেখলে হেইলিকে। তেতাল্লিশ

বছর বয়েস, এখনো বিয়ে করেনি—কিন্তু কী মজবুত, কেমন স্ফূর্তিবাজ। আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এসেছে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কর্‌তে! কত ওদের উৎসাহ।

কথাটা কুমুদ বুঝিল। কলেজে পড়িবার সময় তাহার কল্পনাও ত' তাহাকে পৃথিবীর কত পথ ঘুরাইয়া আনিয়াছে। শেষে এমন একটা জায়গায় আসিয়া সে থামিয়া পড়িল যে তাহার চলিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত ফিরিয়া পাইল না। বিবাহ না করিলে সে হয় ত' এমন করিয়া তাহার পৃথিবীকে ছোট করিয়া আনিত না, হয় ত' কিছু-কিছু করিয়া টাকা জমাইয়া একদিন ভারত-সমুদ্রের উপর ভাসিয়া পড়াও তাহার সম্ভব হইত। সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সে চিরকালের জন্য দুয়ার দিয়া রাখিয়াছে। এই আরামময় নিশ্চিন্ততা—সে যে তাহার কী সাঙ্ঘাতিক নৈতিক অপমৃত্যু, আজ তাহা সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বুঝিয়া লইল। গোত্র ও গণ মিলাইয়া বিবাহ করিতে গিয়া সে যাহাকে সঙ্গে লইয়াছে, সে কখনই পায়ের সঙ্গে পা মিলাইতে পারিতেছে না, অনবরত পশ্চাতে রহিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিতেছে। যতটুকু শক্তি তাহার অবশিষ্ট ছিল, তাহা এই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়াই অপব্যয়িত হইয়া গেল!

মনের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল—অভ্যাস বন্ধু, অভ্যাস। পরিষ্কার করিয়াই কথাটা বুঝাইয়া বলি। ধর, অণুকে—হ্যাঁ, এই অণুকেই যদি বিবাহ করিতে, দেখিতে সেও ছয়মাস পরে তাহার সমস্ত সঙ্কেত হারাইয়া স্থূল ও স্থাণু হইয়া পড়িয়াছে। যাহা আজ অনির্ব্বচনীয় তাহাই ক্রমশ সাধারণ ও তুচ্ছ হইয়া উঠিত। এই অপরিচয়ের স্বল্প অবগুণ্ঠনটুকু আছে বলিয়াই অণুকে আজ এমন রহস্যমণ্ডিত মনে হইতেছে। অণুই হোক্

আর ডলিই হোক্—সবাই বইয়ের মলাট, অপরিচ্ছন্ন হইতেই হইবে। খোলসটা লোকসান যাইবেই। তবে এমন বই অনেক আছে বটে, যাহা শতবার পড়িলেও বহুদিন পরে আরও একবার পড়িতে ইচ্ছা করে—সে মানুষের প্রথম প্রেম,—মনে হয় পুরাকালের, তবু তাহা কোনোদিন পুরাতন হয় না। অতএব অনুতাপ করিয়া লাভ নাই।

কুমুদ এই প্রবোধবাক্যে বিশ্বাস করিল না। অণুর বেলায় নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম হইত। প্রতিটি মুহূর্ত্তেই যেন তাহার জীবনের পট-পরিবর্ত্তন চলিতেছে। সে নিশ্চয়ই এমন করিয়া নিজেকে উজার করিয়া ঢালিয়া দিয়া ফতুর হইয়া যাইত না, হাতের পাঁচ সে হাতেই রাখিত। কুমুদ কি করিতেছে ভাবিয়া দেখিল না, অণুর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইল।

অণুও কাজে কাজেই ভাবাকুল কণ্ঠে স্বগতোক্তি সুরু করিয়া দিল—সে চিরকুমারী থাকিবে; কিছু টাকা তাহার জমিয়াছে, দিল্লিতে একটা হিল্লে হইলেই সে সময়, তরঙ্গ ও সমাজের রুচির সঙ্গে পাল্লা দিয়া জীবনে নব-নব পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। প্রথমে যাইবে সে জার্ম্মানি, সেখানে সে নার্সিং শিখিবে; সেইখান হইতে একবার রুষিয়ায় যাওয়া তার চাই, বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে সে মিশিবে এবং আফ্‌গানিস্থান হইয়া একদিন ভারতবর্ষে সে আসিলেও আসিতে পারে।

কিন্তু নৌকা করিয়া আহিরিটোলার ঘাটে আসিতেই হঠাৎ বৃষ্টি

আসিয়া গেল। অণুর স্ফূর্তি যেন আর ধরে না,—ডলি হইলে নিশ্চয়ই বসিয়া-বসিয়া খালি হাঁচিত। অণু কহিল,—চল ভিজি, রাস্তায় ট্যাক্সি পেলেই উঠে পড়ব।

কুমুদ কহিল,—না পেলে ?

—তখন দেখা যাবে। এস না চলে'। শরৎকালের বৃষ্টি— বেশিক্ষণ থাকবে না। এই আনন্দটুকু মাঠে মারা যায় কেন ?

ভাড়া চুকাইয়া দিয়া দুইজনে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখুনিই ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, মাঝখান হইতে এক নিশ্বাসে বৃষ্টিটুকুই শুধু ফুরাইয়া গেল।

ব

ঢাকুরিয়ার লেইক হইয়া বাড়ি ফিরিতে-ফিরিতে দশটা বাজিয়া গেল। বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিল একতলার বারান্দায় বসিয়া কানাই দেয়ালে পিঠ রাখিয়া একমনে ঝিমাইতেছে—রান্নাঘর অন্ধকার। উপরে চাহিয়া দেখিল সেখানেও বাতি জ্বলিতেছে না। কুমুদের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সিঁড়ির আলোর সুইচটা টানিয়া দিয়া অণুকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। অণু অবশ্য শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল না,— দোতলার ছোট বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

—ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালাইয়া কুমুদ যাহা দেখিল তাহাতে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার জোগাড় হইল। মেঝের উপর ডলি লুটাইয়া

রহিয়াছে, সারা ঘরে কাপড়-চোপড় বই-পত্র ছত্রখান। আ'লনাটা কাৎ, দোয়াতদানিটা উল্টানো। খাটের উপর বিছানার বদলে একটা ঝাঁটা। ঘরের এই লক্ষ্মীছাড়া চেহারা ও ডলির এই অবসন্ন শয়নাবস্থাটা দেখিয়া সে আরেকটু হইলে একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত হয় ত', কিন্তু সহসা চোখ চাহিয়া ডলি তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়া ফুলিয়ে'-ফুলিয়ে কাঁদিয়া উঠিল।

এইবার কুমুদের বিরক্তির আর সীমা রহিল না। অন্য যাহাতে স্পষ্ট করিয়া শুনিতে না পায় কণ্ঠস্বরটাকে ততদূর সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া সে ধমক দিয়া উঠিল—ঘরদোরের এ কী করে' রেখেছ? কী হ'ল তোমার? হঠাৎ এত কান্না উথলে উঠল কোথা থেকে!

এই সব কথার উত্তর নাই, ডলি অনর্গল কাঁদিয়া চলিয়াছে। এই কান্না যেন দুঃখসম্ভাত নয়, পুঞ্জীভূত অপমানের অসহায় প্রত্যুত্তর। কুমুদ নীচু হইয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া একটু স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—কী হয়েছে বল না লক্ষ্মীটি!

যেন চোখের সমুখে সাপ ফণা তুলিয়াছে তেমনি ভয়ে ও ঘৃণায় ডলি নিজের শরীরটাকে গুটাইয়া সরিয়া গেল, অতিশয় রূঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে।

—ছোঁব না?

কুমুদের কণ্ঠস্বরে ভীষণ ঝাঁজ।

—না, না; ককখনো না, কোনদিন না।—বলিয়া ডলি আরো একটু সরিয়া গেল।

কুমুদ কঠিন হইয়া বলিল,—রান্না করে' রেখেছ?

এইবার ডলি উঠিয়া ব'সল। মুখ ঝামটাইয়া বলিল—কেন রান্না

করে' রাখবো? কার জন্যে? উনি রাত্রি বারোটার সময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়ে আসবেন, আর আমি তাঁর জন্যে ভাতের থালা বেড়ে রাখব! কেন? আমি কি তোমার দাসী? আমি তোমার কেউ নই।

বলিয়া আবার কান্না।

কুমুদ স্বরকে চড়িতে দিল না—ঘরে অতিথি উপস্থিত, তাঁকে তুমি অপমান করবে?

মুখ হইতে আঁচল সরাইয়া ডলি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—কে তোমার অতিথি? থাক না তাকে নিয়ে? আমার কাছে এসেছ কেন তা হ'লে? যাও না, ঐ ঘরে তোমাদের বিছানা করে' রেখেছি। লজ্জা করে না বলতে! অতিথি এসেছেন! সারাদিন আপিস কামাই করে' হন্যে কুকুরের মত পিছু পিছু ছুটলে,—ক'টুকরো মাংস মিলল শুনি?

ছি ছি ছি! কী বর্ব্বর, কী অশিক্ষিত! এইটুকুন মেয়ের মধ্যে এত বিষ! স্নিগ্ধতার আবরণ দিয়া এতদিন ডলি তাহার মনের এই জঘন্য ঘা-টা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শেষকালে তাহার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত। এই সব সঙ্কীর্ণমন হীন বুদ্ধি মেয়ে লইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার স্বপ্ন দেখে! একটি সমাজসম্পর্কহীন মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে জীবনের দুইটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিবার বিরুদ্ধে এত সন্দেহ, এত চিত্ত-দারিদ্র্য! অলক্ষ্যে কুমুদের মুঠা দুইটা দৃঢ়, পেশীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল।

অদূরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অণু যে নিবিষ্ট হইয়া আকাশ দেখিতেছে পাছে তাহার কাছে নিজে খেলো হইয়া যায় সেই ভাবিয়াই দিগ্বিদিক না চাহিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

এবং তৎক্ষণাৎ সবলে ডলির হাত ধরিয়া তাহাকে মেঝে হইতে তুলিয়া চাপা অথচ কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মুখ সামলে কথা বল। আমাকে তুমি চেন না।

ডলিও খেঁকাইয়া উঠিতে জানে—মারবে নাকি? মারো না, ফেল না আমাকে মেরে।

হাতটা ছাড়িয়া দিতেই ডলি মেঝের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কুমুদ কহিল,—আমার বন্ধুকে অমান্য করা আমি কক্খনো সইব না। ছোটলোকোমি করতে হয় চাকর-বাকরের সঙ্গে করো, কিম্বা বাপের বাড়িতে গিয়ে। এখানে এ-সব চলবে না বলে' রাখছি।

—একশো বার চল্‌বে। হাজার হাজার বার। কে ছোটলোক শুনি? কে নিজের বউকে ফেলে পরের মেয়ে নিয়ে এমন হন্যে হয় শুনি? বন্ধু! যাও না, যাও না, থাক না ঐ বন্ধুকে নিয়ে। এখানে কেন এসেছ মরতে?

কুমুদের একেবারে কিছুই করিবার উপায় নাই, আকাশে চাঁদ ও তাহার দ্রষ্টা-হিসাবে বারান্দায় অনু না থাকিলে সে হয় ত' ইহার উচিত প্রতিবিধান করিত। কিন্তু তবুও তাহার কণ্ঠস্বরে জ্বালা কম ছিল না। কহিল,—যাবই ত' বন্ধুর কাছে। তোমার কাছে মরতে আসতে কা'র এমন মাথাব্যথা?

বলিয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

৬

অনু তখনো তেমনি রেলিঙ ধরিয়া তন্ময় হইয়া বাহিরের দিকে

চাহিয়া আছে। কুমুদের পায়ের শব্দে তাহার ধ্যান ভাঙিল না। মেঘ খানিকটা সরিয়া যাওয়াতে আকাশের একটা প্রান্ত জ্যোৎস্নায় একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে ; দৃষ্টিটাকে একটু নামাইয়া আনিলে সুষুপ্ত অট্টালিকার চূড়াগুলি যেখানে ভিড় করিয়া আছে তাহার উপর চোখ পড়িয়া বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মুহূর্ত্তে কুমুদের মনের বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন ধুইয়া গেল।

অণু অমন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এমন দৃশ্য যে পৃথিবীতে কত আছে তাহার হিসাব করিতে গিয়া কুমুদ হাঁপাইয়া উঠিল,—যে-সব দৃশ্য দেখিলে মনে আপনা হইতেই ভালবাসিবার সাধ জাগে, বাঁচিয়া থাকাটা একটা মোহময় অনুভূতিতে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া সমস্ত আকাশে-ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে,—সেই সব দৃশ্য তাহার জীবন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সে যেন এতদিন একটা স্বল্প-পরিমিত অস্তিত্বের কারাগারে বন্দী হইয়া দিন কাটাইতেছিল।

কিন্তু অণু যে কত সুন্দর তাহা সে বুঝিতে পারিল এতক্ষণে—আলো-অন্ধকারে। পিছন হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া দেখিল বলিয়া অণুকে ঠিক একটা মানুষ না ভাবিয়া একটা কায়াহীন কল্পনা বলিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হইল—যে-কল্পনায় না আছে জরা, না বা পরিণাম! একেবারে কাছে আসিতেই অণু হাসিয়া কহিল,—একটুখানি কবিত্ব করছিলুম মনে মনে।

যাক্, বাঁচিয়াছে—ঘরের মধ্যে খানিক আগে যে একটা কদর্য্য ঝগড়া হইয়া গেল তাহা অণুর কানে আসে নাই। চোখের সম্মুখে এমন দৃশ্য

উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিলে বোধ করি সমস্ত গ্লানি ও নিরানন্দতাকে অস্বীকার করা যায়। তাই স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া কুমুদ কহিল,—তুমি ত' কবিত্ব করছ, কিন্তু এদিকে গিন্নির জোরসে জ্বর এসে গেছে।

—জ্বর? হঠাৎ হ'ল? অণুর চোখে উদ্বেগ।—কই, দেখি।

কুমুদ তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—শুয়ে আছে। ম্যালেরিয়া, সেরে যাবে'খন। এদিকে রান্নার কি জোগাড় হ'বে? তুমি রাঁধতে পারবে, অণু?

অণু স্বচ্ছন্দে রাজি হইয়া গেল,—খুব পারব, আমাকে তুমি ভাব কি?

—অতিথিকে বিড়ম্বিত করছি।

—হস্‌পিটেবল্ হ'তে গিয়ে ত' বাড়িতে হস্‌পিটেল্ বানিয়েছ। চল, দেরি করে' লাভ নেই—রাত হয়েছে। একটু পরেই বেজায় ঘুম পাবে আমার। উনুন ধরানো আছে?

—উনুন লাগবে না, নীচে ষ্টোভ আছে। ডালে-চালে দু'টো বসিয়ে দাও দুজনের আন্দাজ। চাকরটাকে পাঠিয়ে বাজার থেকে ডিম আনাচ্ছি। ওকে পয়সা দেব—বাজার থেকে খাবার কিনে খাবে'খন।

দুইজনে নীচে নামিল। কুমুদ নিজ হাতে সব জোগাড় করিয়া দিল,—নিজ হাতে ষ্টোভ ধরাইল, আল্‌মারি হইতে বাটি করিয়া ঘি বাহির করিয়া দিল।

অণুকে রান্নায় বসাইয়া এক ফাঁকে উপরে আসিয়া দেখিল তাহাদের শুইবার পাশের ঘরে সত্যই দুই জনের মত বিছানা করা হইয়াছে। ডালটা যে নির্লজ্জতার কোন্ ধাপে নামিয়াছে কুমুদ তাহা

ভাবিয়া পাইল না। দুইটা বালিশ তাড়াতাড়ি সে সরাইয়া ফেলিল, এবং সরাইয়া ফেলার দরুণ যে-যে জায়গায় কুঁচ্‌কাইয়া গেল তাহা সযত্নে টান করিয়া সে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে দেখিতে পাইল ডলি কখন অণুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় এই মাত্রই আসিয়াছে। অণুর হাত হইতে বড় চামচটা কাড়িয়া নিয়া ডলি বলিয়া উঠিল,—যান্‌, যান্‌, আপনার আর কষ্ট করে' রাঁধতে হ'বে না।

অণু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—তোমার জ্বর, নেমে এলে কেন?

—হ্যাঁ জ্বর, একশোবার জ্বর। দেখুন না এই হাতটা! উনুনের চেলা-কাঠের মত পুড়ে' যাচ্ছে! দেখুন্‌ না!

অণু হতভম্ব হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে কোন-দেশী আচরণ সে সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ডেক্‌চিতে হাতাটা নাড়িতে-নাড়িতে ডলি খোঁটা দিয়া কহিল,—চা'ল্‌ নিয়েছেন ত' দু'জনের মাত্র। আমাকে সারা রাত উপোস করিয়ে রাখবেন আর কি! যান্‌, এখেনে দাঁড়িয়ে কী আর দেখছেন? আমি নেমে এলাম, আপনি ওপরে উঠুন। উনি যে আপনাকে ডেকে-ডেকে হায়রান হ'য়ে গেলেন।

অণু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, জ্বরের ঘোরে মেয়েটা প্রলাপ বকিতেছে নাকি? কিন্তু পাছে পিছন ফিরিয়া উপরে উঠিবার সময় চোখোচোখি হইয়া যায় সেই ভয়ে কুমুদ সিঁড়ির উপর আর দাঁড়াইয়া রহিল না।

ডলি ডেক্‌চিতে আরো ক'টি চা'ল ছাড়িয়া দিল—নিজের জন্য নয়, ঠাকুরপো বিনোদের জন্য। স্বামী না হয় তাহাকে উপবাসী রাখিতে

চান্, সে থাকিবেও তাই—কিন্তু নিজের ভাই-এর কথা তিনি ভুলিলেন কেমন করিয়া? বিনোদ সাড়ে-ন' টার বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে, ফিরিতে তাহার রাত হইবে।

৮

খাওয়া দাওয়ার পর কুমুদ ও অণু দোতলার বারান্দায় দুইখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে। ডলি বিনোদকে খাওয়াইয়া ও নীচে তাহার বিছানা করিয়া শোয়াইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। এমন আশ্চর্য্য যে বারান্দাটুকু পার হইবার সময় হঠাৎ মাথার উপর লম্বা একটা ঘোমটা টানিয়া দিল—যেন পরপুরুষ দেখিয়াছে। অণু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

অণু উপরে উঠিয়াই নতুন করিয়া কুমুদকে ডলির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিল, বহু কষ্টে বহু প্রশ্ন এড়াইয়া কুমুদ সেই কথার মোড় ঘুরাইয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কাছে নিয়া আসিয়াছে। ডলির এই বিস্ময়কর আচরণে কথার স্রোত আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। অণু কহিল,—তোমার বউর বাপের বাড়ি কোথায়? মাষ্টার-টাষ্টার রেখে একটু লেখা-পড়া শেখালে পার।

এই সব কথা যাহাতে আর না উঠিতে পারে কুমুদ তাহার উপায় এক মুহূর্ত্তে উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। কহিল,—এক কাজ করলে মন্দ হয় না, অণু। আমিও তোমার সঙ্গে দিল্লি যাব।

—যাবে? উৎফুল্ল হইয়া অণু কুমুদের হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিল।—চমৎকার হয় তা হ'লে।

—যাব। কিন্তু পরশু নয়, কালকেই—পাঞ্জাব মেলে। উদয়শঙ্করের নাচ না হয় এইবার না-ই দেখা হ'ল! য়ুরোপে গিয়েই দেখো।

—কেন? একটা দিন থেকে গেলে কী হয়?

—না। সমস্ত মহাভারত এক দিনেই অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। যে-দিনটা তুমি কল্‌কাতায় কাটিয়ে দিতে চাও, সেটা আমার দিব্যি টুণ্ডলায় নেমে আগ্রায় তাজমহল দেখেই কাটিয়ে দেব'খন।

—সত্যি? অণু খুসিতে হাততালি দিয়া উঠিল।—তবে তাই চল, কিন্তু তোমার বউকে কোথায় রেখে যাবে?

কথাটা অণু এমন ভাবে বলিল যেন বউ একটা সুটকেশ বা হোল্‌ড-অল্‌ জাতীয় সামান্য জিনিস মাত্র। অন্য সময় হইলে কুমুদ অত্যন্ত পীড়া বোধ করিত, দরকার হইলে বক্তাকে উল্টা পীড়ন করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু আজ সে স্বচ্ছন্দে ঠোঁট কুঁচকাইয়া বলিল,—ও কথা ছেড়ে দাও। সে-ব্যবস্থা একটা হবেই।

ইহার পর দুইজনে দেশভ্রমণের কথা লইয়া মাতিয়া উঠিল কুমুদ হিসাব করিয়া দেখিয়াছে কিছু ছুটি তাহার পাওনা আছে, সে কাল সকালেই কঠিন একটা অসুখের অছিলা করিয়া জরুরি দরখাস্ত করিবে। বিপত্নীক হইয়াছেন পর বড়বাবুর মেজাজ ভাল হইয়াছে—দরখাস্ত নাকচ করিবেন না। ভাল লাগিলে আবার টুণ্ডলা হইয়া সে না হয় দিল্লিতেই যাইবে,—কাহারও মোটর পাইলে একেবারে ফাঁকা রাস্তা দিয়াই গড়াইয়া পড়িতে পারে। এই সব জল্পনা কল্পনা নিয়া দুইজনে এত ব্যস্ত

হইয়া উঠিল যে, এ-রাত্রি যে কোনোকালে অপসৃত হইবে এমন কথা তাহাদের মনে হইল না।

কথার পিঠে কথা বলিতে-বলিতে কুমুদ এমন মত্ত হইয়াছে যে, এক সময় ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল,—আজকের রাতটা ভারি চমৎকার লাগছে। চোখে চোখে চেয়ে থাকার রাত, জেগে কাটিয়ে দেওয়ার রাত।

অণুর কবিত্বের চেয়ে ঘুম বেশি। সে অবজ্ঞার সুরে কহিল—পাগল হয়েছ? ঘরে বৌ তোমার একলা শুয়ে আছে আর তুমি এখানে দিব্যি রাত জাগবে? সি-এস্-পি-সি-এ ধরে' নিয়ে যাবে যে।

এই কথাটাও ডলির পক্ষে মর্য্যাদাকর হইল না। কুমুদ কহিল,—রোজই ত বউ আছে, কিন্তু এমন আকাশ ভরে' মেঘ করে' গোপন চন্দ্রোদয়ের রাত মানুষের জীবনে হয় তো একেবারেই এসে থাকে। এ-রাত বৃথায় চলে' যেতে দিতে নেই। তোমার কি সত্যই ঘুম পাচ্ছে, অণু!

বলিয়া কুমুদ অণুর দুইখানি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া ফেলিল। দুই হাতে দুই গাছি করিয়া সোনার চুড়ি।

অণু ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া নিল। কহিল,—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি কোথায় শোব? বারান্দায়? সত্যিই আর বসতে পাচ্ছি না।

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—বেশিক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেক না, পাগল হবে, সাবধান। বউকে ডাক না, শোবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই একটা করেছে।

অগত্যা কুমুদকেই ঘর দেখাইয়া দিতে হইল। অণু আর একটুও আলস্য করিল না—বেড়াইয়া আসিয়াই সে কাপড় চোপড় ছাড়িয়াছে,

দরজাটা তাড়াতাড়ি ভেজাইয়া দিয়া সে বিছানায় টান হইয়া শুইয়া পড়িল।

কুমুদের কাছে অণুর এই ব্যবহারটা আশাপ্রদ মনে হইল না। হাত ধরাটা বোধ হয় অন্যায় হইয়াছে—কিম্বা হাতের যেটুকু ধরিলে অপরাধ হয় না সে তাহার অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল হয় ত', বা সময়ের কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিয়াছে, হয় ত' বা আরো বেশিক্ষণ ধরিয়া থাকা উচিত ছিল। কে জানে, হয় ত' এই আচরণটিতেই অণুর অনুরাগ বেশি করিয়া সূচিত হইতেছে। যাহা হউক, দিল্লি যাইবার কথা শুনিয়া এত উৎফুল্ল হইয়া সহসা আবার এমন করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার কারণটা কুমুদ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিল না।

অথচ বেলুড় মঠে মিষ্টার হেইলির সঙ্গে দেখা করিবার সময় কতবার যে অণু বলিয়াছে এমন রাত না ঘুমাইবার রাত। এমন দৃশ্য তোমাদের আমেরিকায় আছে?

কুমুদের বাড়ির কাছে অবশ্য গঙ্গা প্রবাহিত নয়, কিন্তু এমন দক্ষিণ-খোলা বারান্দা কয়টা বাড়ির আছে শুনি? এখানেও সেই আকাশ, সেই প্রচুর অবসর, সেই বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা!

বাধ্য হইয়া কুমুদ নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল না-খাইয়াই ডলি তেমনি মেঝের উপর পড়িয়া আছে—বিছানাটার এক তিলও সংস্কার হয় নাই। ডলিকে ডাকিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। খাট হইতে ঝাঁটাটা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে শুধু-জাজিমটার উপরেই শুইয়া পড়িল।

শুইয়া পড়িল, কিন্তু সহজে কি আর ঘুম আসে! ভাবিতে লাগিল

এমন সঙ্কীর্ণচিত্ত অশিক্ষিত বন্য স্ত্রী লইয়া তাহার সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে—সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? ডলির মত মৃদুস্বভাবা মেয়েও যখন অকাতরে এত বিষ উদ্গীরণ করিতে পারিল, তখন সংসারে আর তাহার আপন জন বলিবার কে রহিল! ঘরের মধ্যে টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল,—তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া দরজা খুলিতে গেল।

ডলি ঘুমায় নাই, স্বামীকে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তবে অত ঘটা করে' এখানে শুতে এসেছিলে কেন? যাও না, তোমার জন্যে এ-পাশ ও-পাশ করছে। ও-ঘরের দরজায় খিল নেই, ঠেলা দিলেই খুলে যায়।

বহু কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কুমুদ বাহির হইয়া আসিল। ইচ্ছা হইল সত্যই অণুর ঘরের দরজাটা ঠেলা মারিয়া খুলিয়া দেয়—বাকি রাত ভরিয়া কত গল্প করিবার কথাই যে বাকি রহিয়াছে। কিন্তু ঘরে ঢুকিলে অণু নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবে,—উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লাভ নাই, ও ঘুমাক্!

ছ

পরদিন দুপুর বেলা কুমুদ নিজেই তাহার সুটকেশ গুছাইতে বসিল। এ সব দিকে ডলির লক্ষ্য নাই, সে আপন মনে ব্লাউজের হাতায় ফুল তুলিতেছে। সে আর কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছে না—তাহার সমস্ত ভঙ্গীটাতে একটা তীব্র উপেক্ষা, অমানুষিক দৃঢ়তা!

কুমুদ কহিল,—আমি দিল্লি চল্লুম।

কথাটা ডলির কানেই ঢুকিল না। কুমুদ আবার বলিল,—দিল্লি, বুঝলে ?

ব্লাউজ হইতে চোখ না তুলিয়াই ডলি উদাসীন স্বরে কহিল,—যাও না, কে তোমাকে ধরে' রাখছে ?

—ধরে' রাখবার মত কেউ নেই-ও। ফিরতে দেরি হ'তে পারে।

ডলি কহিল,—দেওয়ালের সঙ্গে কথা বল।

—বিনোদকে বলো সে যেন এ ক'দিন বায়োস্কোপ যাওয়াটা বন্ধ রাখে। বিকেল বেলাটা তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দেখা-বিন্তি খেলে কাটিয়ে দিতে পারবে। আমার নাম করে' তাকে বোলো।

—সে কি তোমার খায় নাকি যে তোমার হুকুম তামিল কর্‌বে ? সে দস্তুরমতো রোজকার করে। আমি বলতে পারব না।

—সে না খায়, তুমি ত' খাও—তোমার সুবিধের জন্যেই বলছি। বেশ, আমিই বলব।

—সে আমার কথা বেশি শুন্‌বে, বলব বায়স্কোপে না গেলে আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো। বায়স্কোপে না গেলে রাত্রে আমি তাকে ককৃখনো রেঁধে দেবো না।

—সারা দিন বাড়িতে বসে' তা হ'লে তুমি কী করবে ?

—বাড়িতে থাকবোই না।

—কোথায় যাবে শুনি ?

—তোমার কাছ থেকে পথের খবর জেনে যেতে হবে নাকি ? আমার দুটো পা নেই ?

—বেশ, বিনোদকে বলে' যাচ্ছি সে তোমাকে বাপের বাড়ি রেখে আসবে।

—বিনোদ আমার সঙ্গে গেলে আমি তাকে যা-তা বলে' পুলিশে ধরিয়ে দেব।

—তোমার যা ইচ্ছা হয় করো।

—মহাশয়কে ধন্যবাদ।

—কানাই কোথায়? আমার বিছানাটা বাঁধবে।

—বাজারে পাঠিয়েছি। বাড়িতে একটা শাঁখ নেই—উৎসব যে কাণা হ'য়ে থাকবে।

—শাঁখ কেন?

—যখন জোড়ে যাবে, ফুঁ দিতে হবে না?

মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া কুমুদ কহিল,—জান, আমি আর ফিরে না-ও আসতে পারি।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ডলি কহিল,—আর আমিই বা কোন্ ফিরে আসব?

সারা দিন ডলি দূরে-দূরে রহিল, বিনোদের সঙ্গে পর্য্যন্ত কথা কহিল না। কুমুদ তাহাকে জলখাবার করিয়া দিতে বলিয়াছে কান পাতে নাই; গেঞ্জিতে বোতাম লাগাইতে বলিল, কাঁচি দিয়া গেঞ্জিটাকে দু' ফাঁক করিয়া দিল; কানাইর হাত হইতে তাঁহার ব্রাউন রঙের সু-টা ছিনাইয়া

নিয়া তাহাতে কতগুলি কালো কালি মাখাইতে বসিল। স্নান করিল না, একটুও কাঁদিল না পর্য্যন্ত।

আটটার সময় কানাই ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। ঘৃণায় ডলি নীচে নামিল না, শাঁখটা হাতে লইয়া দোতলার বারান্দায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কানাইর বুদ্ধি দুইখানেই সমান খুলিয়াছে—একটা ঝর্ঝরে ট্যাক্সি ধরিয়া আনিয়াছে, চলিতে গেলে ভীষণ শব্দ করে, আর বাছিয়া বাছিয়া একটা শাঁখ আনিয়াছে, তাহাতে আওয়াজ বাহির হয় না। তবু ট্যাক্সিটা সমুখ দিয়া যাইবার সময় ডলি শঙ্খের মুখে প্রাণপণে ফুঁ দিল, কিন্তু তাহা শুনিল কেবল ঈশ্বর।

শঙ্খটা সজোরে রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডলি কাটা-ছাগলের মত ছটফট্ করিতে লাগিল।

৯

কানাইরামকে একগাছি সোনার চুড়ি ঘুস্ দিয়া দুপুরেই [illegible] এক টাকার আফিং আনিতে পাঠাইয়াছে। কানাই সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিয়াছিল,—এক টাকার একসঙ্গে কিন্‌তে গেনু বলে' সবাই আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বল্‌লে। তোমার কথা মত বল্লু, মা-ঠাক্‌রুণের পায়ে ব্যামো, মালিশ কর্‌বে। সবাই মারতে আসে—আফিং আবার মালিশ করে না কি? বলে—কোন্ বাবুর বাড়িতে কাজ করিস্? ঠিকানা দে। ছুটে পালিয়ে এনু, মা।

ভীত, উদ্বিগ্ন হইয়া ডলি প্রশ্ন করিয়াছিল—আনিস্‌নি?

এক গাল হাসিয়া কানাই বলিল,—কানাইলাল কি তেমনি বোকা? চার পাঁচ দোকান ঘুরে ঘুরে আট আনার আন্‌তে পেরেছি, মা। কালীঘাট থেকে সেই বউবাজার। শেষকালে দোকান সব বন্ধ করে দিলে। এতে তোমার গাঁটের ব্যথা সার্‌বে ত'?

—সারবে।

বলিয়া তাড়াতাড়ি ঠোঙাটা ডলি লুকাইয়া ফেলিয়াছিল।

এখন এই নির্জ্জন শূন্য পুরীতে ডলি ভাবিতে বসিল। আফিং খাইলে লোকে মরে—জানিত বটে, কিন্তু কতটুকু খাইলে খতম্‌ হয় তাহা সে ভাবিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিল না। এক টাকার আফিং দেখিতে বেশি মনে হইল না, শেষকালে কি সে আধা-পথে থামিয়া পড়িয়া নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবে? সে যে মরণের চেয়েও বেশি লজ্জা, বড় পরাজয়। গলায় দড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু ঝুলিয়া পড়িবার মত একটা অবলম্বনও তাহার চোখে পড়িল না। কেরাসিন তেল সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু সাত দিন আগে ফেন গালিতে গিয়া পায়ের খানিকটা পুড়াইয়া ফেলিয়া আগুনে জ্বলিবার সুখ সে বুঝিয়াছে। সেই ঘা-টা এখনো শুকায় নাই।

এই আফিংটুকু খাইবার জন্যই সে সমস্ত দিন উপোস করিয়া রহিয়াছে—ইহাতেই তাহার কুলাইবে নিশ্চয়।

যদি বাঁচিয়াও উঠে—মন্দ কি! জাগিয়া হয় ত' দেখিবে স্বামীর কোলেই মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে, আগের দিনের মত স্বামী তাহার কোঁকড়ানো চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তবু ত' স্বামীর একটা শিক্ষা হইবে, লোকে জানিবে স্ত্রীর প্রতি তিনি কী পৈশাচিক দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। স্বামীর মুখে চুণকালি পড়িবে, তাহা হইলে সেই কলঙ্ক মুছাইয়া দিতে স্বামীর মুখে চুমা খাইতে সে একটুও দ্বিরুক্তি করিবে না।

তাহারই স্বামী, তাহারই ঘর-দোর—সব একজন আসিয়া এমন অনায়াসে, এমন অপ্রতিবাদে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, আর তাহারই প্রতিকার করিতে সে বিষ খাইতে বসিয়াছে! সেও পুঁটুলি বাঁধিয়া স্বামীর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল না কেন? পুরুষের না হয় নিষ্ঠা নাই, কিন্তু পৃথিবীর যিনি চালক তিনিও কি ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন নাকি? ডলি দুই হাত জোড় করিয়া নত-জানু হইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে বসিল।

সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল—বিনোদ আসিয়াছে। বিনোদকে না খাইতে দিয়া সে যে কী করিয়া মরিতে বসিয়াছিল তাহা ভাবিয়া নিজের উপর তাহার রাগের আর সীমা রহিল না। কানাইটা অঘোরে ঘুমাইতেছে, উনি একবার ফিরুন, উহার মাইনে পাওয়া দেখাইয়া দিবে। ডলিই নিজে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বিনোদ কাঁধে করিয়া

একটা ক্যারম্-বোর্ড লইয়া আসিয়াছে। ডলির খুসি আর ধরে না। সমস্তরাত জাগিয়া সে আজ ক্যারম্ খেলিবে।

মাঝরাতে হঠাৎ অনেকগুলি কাক এক সঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। ভীত হইয়া ডলি জিজ্ঞাসা করিল,—এখন রাত কতটা ঠাকুরপো ?

পকেট হইতে একটা ফাইন্ তুলিতে তুলিতে বিনোদ কহিল,—দুটো বাজে। তোমার ঘুম পাচ্ছে ? ঘুমাও তা'হলে।

—না। ওদের ট্রেনটা এখন কদ্দুর গেছে বল্‌তে পার ?

ঝ

ভিড় ছিল না ; সেকেণ্ড্ ক্লাশ কামরাটা একরকম খালিই ছিল বলিতে হইবে ; উপরের বার্থে একটি মাত্র মুসলমান ভদ্রলোক বর্দ্ধমান পার হইতেই শুইয়া পড়িয়াছেন। আসানসোল পর্য্যন্ত অণু আর কুমুদ কত বিষয় নিয়া যে কথা কহিল তাহার দিশা নাই। প্রতিটি মুহূর্ত্তে কুমুদের মনে হইতেছিল সে যেন তাহার পরজন্ম আবিষ্কার করিতে নূতন একটা নক্ষত্রলোকের পানে যাত্রা করিয়াছে।

আসানসোল পার হইতেই কুমুদ অণুকে শোয়াইয়া দিল। নিজের বার্থে ফিরিয়া আসিয়া এঞ্জিনের উল্টা মুখে মুখ বাড়াইয়া দিয়া সে মাটির উপর ধাবমান ট্রেনের ছায়া দেখিতে লাগিল। এই ট্রেন যদি কোনকালে আর না থামে, কোনোকালে আর যদি ক্ষুধা বোধ না হয়—তবে সমস্ত সমস্যাটা এক নিমেষেই জল হইয়া যায়। কুমুদ আর ফিরিবে না। ঘরে

যাহার এমন রণ-চামুণ্ডা বিরাজ করিতেছে সে কোন্ সুখে সেখানে আর গলা বাড়াইয়া দিবে !

পুরুষের স্ত্রী ত্যাগ করাটা কু-প্রথা নয়—রামচন্দ্র হইতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত তাহার নজির আছে। যাহাই বল, নিজের সুখ শান্তির চেয়ে বড় পরমার্থ আর কি আছে? সীতাকে ত্যাগ না করিলে রাম গুম্‌খুন হইতেন—আর স্ত্রী-ত্যাগের ফলে পরম নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন স্বার্থসন্ধিৎসু বুদ্ধদেবই। স্বার্থ স্বার্থই; তাহার মধ্যে বড় ছোটর তারতম্য করিতে যাওয়াই বোকামি।

কিন্তু ডলি যদি গলায় দড়ি দিয়া মরে! বাঁচা যায়! আন্দামান হইতে হঠাৎ ছাড়া পাইয়াও বন্দীরা হয়ত' এমন মুক্তির আস্বাদ পায় না। আবার সে জ্যা-মুক্ত তীরের মত স্বাধীন হইয়া উঠিবে—অবাধ ও বেগবান। কোনো দায়িত্ব নাই, না কোনো বন্ধন। সময়ের মত নিয়তচলমান, ঢেউয়ের মত ফেনিল, উদ্বেল, মুখর। নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে কী বিস্তীর্ণ সুখ রহিয়াছে তাহা সে বিবাহের আগে বোঝে নাই কেন? কিন্তু অণুকে যদি আজ কেহ নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া লইয়া যায়, তবে আজি তার এই নিঃসঙ্গতা কি আবার ক্লান্তিকর হইয়া উঠিবে না?

গাড়ি মধুপুর ছাড়িয়াছে। কুমুদ অণুর দিকে চাহিয়া দেখিল। ঘুমাইয়া পড়িলে নারীকে রাত্রির চেয়েও রহস্যময়ী মনে হয়। চারিদিকে কী অপরিমেয় স্তব্ধতা এবং তাহারি সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কুমুদের বুকে প্রচুর প্রচণ্ড আবেগ। সে কী করিবে বুঝিতে পারিল না। তবু ধীরে ধীরে অণুর শিয়রে আসিয়া চোরের মত বসিল। সে এই রহস্যকে উন্মোচন করিবে! অণুকে তাহার চাই। পরিপূর্ণ করিয়া চাই।

এইখানে যবনিকা ফেলিয়া দিতে পারিতাম ; কিন্তু অণু হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল,—তুমি না বিবাহিত ?

শিকল টানিয়া দিবার দরকার হইল না ; খুব ভোরে মোকামায় আসিয়া গাড়ি পৌঁছিতেই কুমুদ একটিও কথা না কহিয়া তাহার স্যুটকেশ ও বেডিং লইয়া নামিয়া পড়িল। অণু একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

শীর্ণ শুষ্ক যমুনার কূলে পাষাণ তাজমহল নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে।

অচিরদ্যুতি

ক

ঘরে তালা-বন্ধ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছি, অন্তঃপুর হইতে ফুল্লু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—চাবিটা দাও।

ফুল্লু আমার ছোট বোন। পকেটে হাত দিয়া কহিলাম,—কেন?

অল্প একটু হাসিয়া ফুল্লু বলিল,—তোমার ঘরে বন্ধুদের একটু বসাবো। বাবার কোর্ট থেকে ফেরবার সময় হয়ে এসেছে, বৈঠকখানায় আর থাকা চলবে না।

চাবিটা তাহার হাতে ফেলিয়া দিলাম, কহিলাম,—তোদের পরামর্শ এখনো শেষ হয় নি?

মাতব্বরের মত মুখ গম্ভীর করিয়া ফুল্লু বলিল,--কাল্‌কেও মিটিং বস্‌বে। তোমার ঘরটা বেশ নিরিবিলি আছে। এই ফাঁকে সবাই মিলে তা'র শ্রী-ও ফিরিয়ে দেবো'খন। সবাই ওরা তোমার ঘর দেখবার জন্যে ভারি বায়না ধরেছে। বলিয়া কৌতুকময় স্বচ্ছ হাসিতে ফুল্লুর চক্ষু দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলাম,—তা হ'লে আমার আর বেরুনো হ'বে না এ-বেলা। (একটু ঠাট্টার সুরে) অতিথিদের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করা দরকার, কি বল্‌?

চৌকাঠে পা রাখিতে যাইব ফুলু আমাকে বাধা দিল। কহিল,—আমি একাই সম্বর্দ্ধনা করতে পার্‌ব, মশাই। মেয়েদের ভিড়ে তোমার আর মাথা না গলালেও চল্‌বে। যে কাজে যাচ্ছিলে যাও। ছ'টার মধ্যে ওদের ফের বিডন ষ্ট্রীটে যেতে হবে।

প্রশ্ন করিলাম,—এই তোরা গান্ধি-যুগের মেয়ে? সামান্য একটা পুরুষের সান্নিধ্যকে এত ভয়?

তালা খুলিতে-খুলিতে ফুলু ঠোঁট কুঁচকাইয়া কহিল,—ভয় না হাতী! তোমার সঙ্গে তর্ক করবার মতো আমার অঢেল্‌ সময় নেই। বিকেল বেলা দোতলা বাস্‌-এ করে' হাওয়া খেয়ে এসো গে যাও।

দরজাটা খুলিতেই বিশৃঙ্খল ঘরের চেহারা দেখিয়া মনে-মনে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বাহির হইয়া গেলে মা অবসরমত এই ঘরে পদার্পণ করেন, তাঁহার সেবা-স্নিগ্ধ কর্ম্মকুশল হস্তস্পর্শে ঘরের সমস্ত নিরানন্দতা দূর হইয়া যায়,—শৃঙ্খলায় ও পরিচ্ছন্নতায় ঘরখানি নির্ম্মল সুন্দর হইয়া উঠে,—খুঁটিয়া খুঁটিয়া একটি ধূলিকণাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাকে ছাড়া আর কাহাকেও বড় একটা এ-ঘরে ঢুকিতে দিই না, বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণ গৃহস্থের মত রোয়াকে দাঁড় করাইয়াই ভদ্রালাপ সারিয়া লই। তাই এতাদৃশ নোংরা অপরিষ্কার ঘরের ওলোট-পালোট অবস্থা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম,—সব জিনিস ভারি অগোছাল বিশ্রী হ'য়ে আছে। এ-ঘরে কিছুতেই তোর বন্ধুদের আসা হ'তে পারে না।

ফুন্থ ফিরিয়া দাঁড়াইল; কহিল,—সাহিত্যিকের ঘর যে বিচ্ছিরি ছত্রাকার হয়ে থাকে—তা ওরা খুব জানে। এ-ঘরের চেহারা দেখে ওরা কক্‌খনো নাক সিঁটকোবে না ; তবে মেঝের উপর এই যে কতকগুলো ময়লা জামা কাপড় টাল্ করে' রেখেছ, এগুলো ধোপার দোকানে দিয়ে এসো দয়া করে'। বলিয়া সে একটা পুরানো খবরের কাগজের উপর সেগুলো ভাঁজ করিয়া রাখিতে লাগিল।

বলিলাম,—ঘর-দোর আমি ইচ্ছে করে' লোক দেখাবার জন্যে অমন নোংরা করে' রাখি না। বোহিমিয়ানদের মতো অপরিচ্ছন্নতা আমার কাছে আর্ট নয়। পেছনে মা আছেন বলেই ঘর-গুছানো বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন থাকি। তোর বন্ধুরা আবার ভুল না বোঝে!

শেষের কথাটা না বলিলেও পারিতাম ; তবু যে-ঘরে, শুধু বাস করি নয়, রাত্রি জাগিয়া কাব্য রচনা করি, সে-ঘরটি কতগুলি অপরিচিত মেয়ের চোখের সম্মুখে এমন করিয়া অনাবৃত রাখিয়া যাইব ভাবিতে কুণ্ঠা হইতেছিল। সামান্য পোষাকেও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়া এই ঘরটির চারিদিকে তাকাইলেই আমি আর গোপন থাকিব না, ধরা পড়িয়া যাইব!

ফুন্থ কিন্তু কথাটার অর্থ ভুল বুঝিল ; কহিল,—না মশাই, তারা জানে আধুনিক কালের লেখকরা আভিজাত্যকে বরদাস্ত করে না। বড়-বড় চুল, বড়-বড় নোখ আর বড়-বড় কথা। নাও, ধরো—এবার সোজা পিট্‌টান দাও দিকি।

কাপড়ের পুঁটলিটা ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম,—এখন ধোবা-বাড়ি যাবার সময় নেই। তোর বন্ধুরা এ-ঘরে এসে কৃতার্থ হবে বলে' ঘরে চুণকাম

করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। ঘরের জিনিস-পত্রে হাত দিস্‌নে কিন্তু, খবরদার!

বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

বেলেঘাটা যাইবার কথা ছিল, কলেজের এক বন্ধু কয়েকটা টাকা ধার দিবে বলিয়া কথা দিয়াছে। কোথাও টাকা পাওয়া যাইবে কিম্বা কোথাও প্রেয়সীর সঙ্গে নিভৃতে দেখা পাইবে—এই দুইটার একটা খবর পাইলেই মানুষের পায়ের বাত নিমেষে নামিয়া যায় নিশ্চয়। তবে একই সময়ে যদি দুইটার দাবী সমান হইয়া উঠে, তবে অন্তত আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, প্রেয়সীর সামান্য স্পর্শের চেয়ে টাকাটাকেই অধিক মূল্যবান মনে করি। এই কথাটা আমার অসাহিত্যিক নেপথ্য উক্তি। সুন্দর বন্ধুদের কাছে এ-কথাটা বলিতে নিশ্চয়ই সঙ্কোচ বোধ করিতাম। অবশ্য সুন্দর বন্ধুদিগকে টাকার সঙ্গে উপমেয় করিয়া অনাবশ্যক মর্য্যাদা দিবার কোনো হেতু নাই; তবু যখন মোড়ের দোকানের ঘড়িতে ছয়টা প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া বেলেঘাটায় বন্ধুর দেখা পাওয়ায় নিরাশ হইয়া ফের বাড়ির মুখে ফিরিলাম, তখন নিজের হলফটা এত সহজে নাকচ হইয়া গেল ভাবিয়া আমার হাসি পাইল।

কিন্তু শ্রাবণের সন্ধ্যাটুকু আজ পরিষ্কার বলিয়াই যে সহসা দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতে পারে না, এ অভয়টুকু দিবার জন্য হাতের কাছে কোন জ্যোতিষ নাই, তাই ছাতাটা সঙ্গে লইতে হইবে। বেলেঘাটায় বন্ধুর

দেখা পাওয়া যায় নাই বলিয়া যে সন্ধ্যাকালেও ঘরে কুনো হইয়া বসিয়া থাকিব, আমি তত বড় সময়নিষ্ঠ বা রুগ্ন সাহিত্যিক নই। বাহিরে বিপ্লব হউক বা প্রলয় প্রবল হইয়া উঠুক, এই সময়টায় সাহেব-পাড়ার রাস্তায় একটু 'প্রোমিনেড্' না করিলে আমার চোখে না আসিবে ঘুম, মাথায় না গজাইবে গল্পের প্লট; তবু, ছাতা একটা সঙ্গে থাকা ভাল। মোড়ের দোকানের ঘড়িটা নির্ভুল সময় রাখে বলিয়া তাহার সত্ত্বাধিকারী কানাই-বাবুকে মনে মনে প্রশংসা করিতে-করিতে অগ্রসর হইলাম।

নির্দ্ধারিত দিনে গেলাম না বলিয়া বন্ধুবর হয়তো এমন রাগ করিয়া বসিবেন যে তাঁহাকে আর ইহজন্মে বাগ মানানো যাইবে না; কানাই-বাবুর ঘড়িটা এত নির্ভুল যে, হাতের ফাঁক দিয়া টাকা কয়টা অনায়াসে ফস্‌কাইয়া গেল। তবু কেন যে নিজের এই গোঁতোমির জন্য গ্যাস-পোসটার উপর কপালটা ঠুকিয়া দিলাম না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়! এই টাকাটার মুখ চাহিয়া দুই সপ্তাহ কাটাইয়াছি, এখন কি না কিনারে আসিয়া নৌকা বানচাল হইয়া গেল! মনে পড়িল পর্শু বন্ধুর মিরাট ফিরিয়া যাইবার কথা আছে। তবু, অনেক রাত করিয়া গেলে বন্ধুবরকে হয়তো বাসায় পাইব এবং কয়েক ঘণ্টার এদিক-ওদিকে হয়তো তাঁহার মেজাজ সাহেবি হইয়া উঠিবে না—এই আশ্বাস লইয়া ছাতা আনিতে বাসায় ফিরিলাম।

সত্য কথা বলিতে কি, বাস্-ভাড়ার পয়সার পর্য্যন্ত নিদারুণ অভাব

হইয়াছে। বোতলওয়ালার কাছে কতগুলি পুরোনো কাগজ-পত্র বেচিয়া সাড়ে তিন আনা রোজগার করিয়াছি—এই সম্বলটুকু লইয়াই আজ বাহির হইয়াছিলাম। বেলেঘাটা হইতে ফিরিবার সময় গল্পের প্লট ভাবিতে ভাবিতে মোটর গাড়ির ধাক্কা বাঁচাইয়া হাঁটিয়া আসিব বলিয়া আমার মনে ক্ষোভ বা পায়ে বাত ছিল না। তবু টাকাটা পাওয়া আমার উচিত ছিল। ফুনুর বন্ধুরা আসিয়া অকারণে এমন উৎপাত না করিলে আমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই মৌলালির মোড় পার হইয়া যাইতাম!

বি, এ পাশ করিবার পর বাবা তাঁহার মত মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য ল পড়িতে আদেশ করিলেন; কিন্তু আইনকে আমি নজরুল ইসলামের "ভীম ভাসমান মাইন"-এর মত একটা উৎকট উপদ্রব মনে করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলাম। 'না' বলিয়া আমার ঘাড়টা যে একবার বেঁকিল, আর সোজা হইল না। এখান সেখান হইতে প্রশংসাপত্র কুড়াইয়া যে একটা কেরানিগিরি জোগাড় করিব তাহাতেও আশ্চর্য্যরূপে নিরুৎসাহ রহিলাম। এ লইয়া বাবার সঙ্গে যে একটা বচসা হইয়া গেল, তাহার ধাক্কায় আমি দোতলা হইতে ছিট্‌কাইয়া নীচে আসিয়া তাঁহার মুহুরির প্রতিবেশী হইলাম। বাবা আঙুল দিয়া রাস্তাই দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একে আমি মা'র উঠাউঠি পাঁচ মেয়ের পর প্রথম পুত্র, তায় দুইবার শূন্য পকেটে ও খালি পায়ে রেঙ্গুন ও হরিদ্বার বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম, কাজেই আমার উপর মা'র দুর্ব্বলতা চরম হইয়া উঠিয়াছিল। মা সত্যাগ্রহ সুরু করিলেন, তাহারই ফলে একটা রফা হইয়া গেল।

ঘর পাইব বটে কিন্তু অন্ন পাইব না; অর্থাৎ বাবার অন্নের গ্রাস

মুখে তুলিতে হইলে আমাকে দস্তুরমত পয়সা গুনিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মানদণ্ড দিয়া বিচার করিয়া বাবার এই নিষ্ঠুর আদেশটা ঠাণ্ডা মেজাজে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু সামান্য একটা পনেরো টাকার টিউশানি জোগাড় করিতেও হাঁপাইয়া উঠিলাম। ঘর ছাড়িয়া যে আর কোথাও বাহির হইয়া পড়িব, তাহারও উপায় ছিল না। পাকে-প্রকারে কথাটা মা'র কানে উঠিতেই মা এমন আকুলি-ব্যাকুলি আরম্ভ করিতেন যে মনটা কাদা হইয়া যাইত। অভাবের মধ্যে বসিয়া শুকাইতে শুকাইতে হঠাৎ একদিন সাহিত্যিক হইয়া উঠিলাম এবং একখানা সাপ্তাহিক কাগজ আমার একটি গল্প পাঁচ টাকা মূল্যে গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করিল। গোড়ায় মেসেই খাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—এখন লুকাইয়া কুন্তর হাত দিয়া মা'র নিজ হাতে তৈরি-করা মিষ্টান্ন আসিয়া আমার মুখগহ্বরে পৌঁছিতে লাগিল।

এখনও কোনো কাজ যোগাড় করিতে পারিলাম না, অথচ দিনে-দিনে বর্দ্ধমান শশিকলাটির মত পরিপুষ্ট হইতেছি দেখিয়া বাবা মা'র প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভবা যে আজকাল খুব টেরি ব্যাগয়ে চলে, গায়ে সিল্ক দেখলাম—ব্যাপার কি? পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে?

মা বলিলেন,—কেন? আজকাল ও গল্প লিখে টাকা পাচ্ছে। কে একজন ওকে ছেলেদের একটা মানে-বই লিখে দেবার জন্যে আগাম টাকা দিয়েছে। নিজেরটা ও নিজেই চালায়। খাচ্ছেও মেসে।

বাবাকে নরম করিবার জন্যই হয়তো মা কণ্ঠস্বরটাকে একটু ভিজাইয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া

উঠিলেন।—গল্প লেখে? পাজিটাকে আজই আমি ঘাড় ধরে' বা'র করে' দেব। কোর্টে আজ প্রকাশবাবু ওর একটা গল্পের যে কী নিন্দেই কর্‌ছিলেন—ছি ছি, ও নাকি সব বস্তির লোক নিয়ে গল্প লিখেছে—লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। এই বলিয়া বাবা সাহিত্যিকদের চরিত্র লইয়া এমন সব গুহ্য কথা বাহির করিতে লাগিলেন যে ঘৃণায় ও রাগে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু হঠকারিতা করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলেই যে খুব একটা সুরাহা হইবে, দূর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার কোনই ইঙ্গিত পাইলাম না। বরং আরো দু'তিন দিস্তা কাগজ ও দু-এক বাণ্ডিল্ মোমবাতি আনিয়া কলম শানাইয়া বসিয়া গেলাম। বস্তিতে যাহারা বাস করে তাহারা গরিব মূর্খ ও স্থূলপ্রবৃত্তি বলিয়াই যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তবে আমার নাম যে ভবানন্দ তাহার জন্য আমিও কম অপরাধী নই। শুনিয়াছিলাম ঠাকুরদার আমলে মা যখন পুত্রবধূরূপে প্রথম এই বাড়িতে পদার্পণ করেন, তখন গান জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই, এমন-কি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও সংশয় উঠিয়াছিল। দাদামশায়ের দেওয়া সেতারটিকে উনুনের চেলা-কাঠ বানাইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, মা'র কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল বলিয়া এই সংসারে তাঁহাকে প্রায় পাঁচ বৎসর মৌনী নির্ব্বাক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সে সব দিন কবে অতীত হইয়া গেছে, তবু আজ সাহিত্যের প্রতি বাবার এই মর্ম্মান্তিক ক্রোধের পরিচয় পাইয়া নিজেদের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে সংশয়াকুল হইয়া উঠিলাম,—নিজের উপরও সন্দেহ হইল, হয় তো পরবর্ত্তী যুগের কাছে আমিও আবার এমনি রূঢ় ও হাস্যাস্পদ হইয়া দেখা দিব!

অধিবাস

যাহা হউক, এত যে রাশি রাশি কাগজ ও সময় ব্যয় করিলাম, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইল না। দেখিতে দেখিতে নাম হইল। বেশি লিখিলেই বাঙলা দেশে নাম কেনা যায়। দু'মাস অসুখ হইলেই দেখিবে পাঠকরা তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। পাঠকরা যাহাতে না ভোলে তাহার জন্য বেশি তো লিখিলামই, এবং এমন কিছু লিখিলাম যাহাতে সমালোচকরা চাঁদা করিয়া এক জোট হইয়া পিছনে লাগিয়া চীৎকার সুরু করিল। শক্তির মাদকতায় মত্ত হইয়া কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিলাম না, দেখিলাম নাম হইয়াছে, সম্পাদকরা তাঁহাদের কাগজের কাটতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন এবং বাবা আমার চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটি পূর্ণবয়স্কা পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন।

ভালবাসিয়া বিবাহ করিব সে গর্ব্ব আমার নাই। লেখা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া কণ্ঠে বরমাল্য দিবে, বাঙালি মেয়েরা এখনও ততটা aesthetic বা সৌন্দর্য্যরস-লিপ্সু হয় নাই। আমার ট্যাঁকটা যদি সৌভাগ্যক্রমে গড়ের মাঠের মত খাঁ খাঁ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এমন মেয়ে পাইতাম যে বাসর রাত্রে স্বচ্ছন্দে আমাকে বলিতে পারিত—তোমাকে দেখবার কত আগে তোমার লেখার সঙ্গে প্রেমে পড়ে' গিয়েছি। কথাটা তখন তাহার মুখে বেমানান্ হইত না। এখন যদি এই লেখার দাবিতে কোনো সুরসিকার পাণিপ্রার্থনা করি, সে নিশ্চয়ই মুখ বাঁকাইয়া এমন একটা ভঙ্গী করিবে যাহা আঁকিয়া তুলিতে স্বয়ং গগন ঠাকুরও পেছপাও হইবেন! অতএব বাবার সন্ধানের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

ছাতা লইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখি আমার ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দেওয়া

হইয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্ত থামিয়া গেলাম। ভিতরে যে একটা কিছু মিটিং হইতেছে এমন মনে হইল না, কিম্বা হয়তো পরনিন্দা না করিলে মেয়েদের মিটিং পূর্ণাঙ্গ হয় না। শ্রাতশক্তিটাকে ধারালো করিবার চেষ্টায় দুয়ারের উপর কান পাতিলাম, স্পষ্ট শুনিলাম অবলা মেয়েদের অবরোধমুক্তা স্বাধীনকর্ত্রী করিবার কথা ভুলিয়া গিয়া মেয়েগুলি মন খুলিয়া আমারই বিষয় লইয়া স্বচ্ছন্দে আলোচনা করিতেছে।

দরজাটা উহাদের মুখের উপর ধাক্কা দিয়া খুলিয়া দিবার কথা মনে হইল, কিন্তু পরের খোলা চিঠি পড়িবার মত এ ক্ষেত্রেও লুকাইয়া সব কথা শুনিবার একটা দুষ্ট ইচ্ছা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, রীতিমত কোমরটা নোয়াইয়া দুয়ারের ও-পিঠে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মুহূর্ত্তে মুখ শুকাইয়া গেল। আমার টেবিলের সামনে ললিতার একটা ফটো টাঙানো ছিল—ঐ মেয়েটি কে, আমারই সাহিত্যসাধনার অন্তরতম অনুপ্রেরণা কি না—এই সব ব্যাপার লইয়া মেয়েগুলি এমন সব ভদ্রালোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে যে, লজ্জায় আমার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল।

আমার টেবিলের উপর যে কেপ্‌লার্-এর একটা কড-লিভার আছে, তাহাও উহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ছি, ছি, তাড়াতাড়িতে কড-লিভারের বোতলের কথাটা মনে হয় নাই। দাঁত মাজিবার জন্ত নিমগাছের কতকগুলি ডাল যে ছুরি দিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাও উহাদের চোখে পড়িয়াছে! মুখ দেখাইবার আর পথ রহিল না। এইবার ড্রয়ার টানিয়া বাঁধানো দাঁতের পুরোনো পাটিটা দেখিয়া ফেলিলেই হয়।

অধিবাস

সত্যই, আমার রুচির তারিফ্ না করিয়া পারিতেছি না। ললিতার ফোটোটা ধরিয়া টান দিতেই তাহার পিছন হইতে পচা শুকনো কতকগুলি বকুল ফুল ও কাঁচের চুড়ির টুক্‌রো মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মেয়েগুলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ নোংরা জিনিসগুলা ময়লা-টিনে ফেলিয়া না দিলে যেন আমার জাত যাইত! বুড়া হইয়াও ছেলেবেলার বোকামির চিহ্নগুলি এখনও লুকাইয়া রাখিয়াছি! তাহা ছাড়া লুঙ্গি পরিয়া সং সাজিয়া রাত্রে ঘুমাইবারই বা আমার কী দরকার ছিল! সেই লুঙ্গি আবার শুকাইবার জন্য ঘটা করিয়া জানলায় মেলিয়া দিয়াছি—হাত বাড়াইয়া একটা চোরেও তাহা চুরি করিয়া নিল না। চোরকে তাহা হইলে বক্‌শিস দিতাম। আমি যে প্রতি সপ্তাহে মার্কেটে গিয়া আনি ফেলিয়া ওজন লইয়া আসি, তাহার কার্ডগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়া নিজের বর্দ্ধিষ্ণু ভুঁড়িটার বিজ্ঞাপন না দিলে যেন ভারতবর্ষ আর স্বাধীন হইত না! কয় ষ্টোনে এক পাউণ্ড হয়, মেয়েরা তাহার নামতা করিয়া আমার ওজন বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। কড-লিভারটাই যে আমার ওজন-বৃদ্ধির কারণ, এই অনুমান করিয়া মেয়েগুলি এমন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল যে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, পা দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলাম।

একটা ক্যামেরা লইয়া আসা উচিত ছিল—মেয়েদের হ্যাবাচাকা মুখ দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া ঢুকিয়া পড়াটা প্রচলিত রীতির ঠিক

অনুকূল হয় নাই। কিন্তু একটা পুরুষের সামান্য শারীরিক নৈকট্যকে এমন সঙ্কোচ করিবারই বা কি হেতু আছে? তবু একটা ওজুহাত দিবার প্রয়োজন ঘটিল। ফুনুকে কহিলাম,—ছাতাটা নেব। জল আসতে পারে। বলিয়া আলমারির পিছনে হাত দিলাম।

শ্রাবণের সন্ধ্যাকালে হঠাৎ পশ্চিম আকাশে রোদের হাসি হাসিয়া বিধাতা কেন যে আমাকে ঠাট্টা করিলেন, বুঝিলাম না! একটি মেয়ে মুচকিয়া হাসিতেছে। চাহিয়া দেখি, ইঁদুরগুলির দৌরাত্ম্যে আমার ছত্রটি একেবারে ছত্রখান হইয়া গিয়াছে।—মেয়েদের প্রতি মাতা বসুন্ধরার পক্ষপাতিত্ব বেশি বলিয়াই আমাকে সেই অটুট মেঝের উপর নিরেট বোকার মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

বাঁচাইল আমাকে ফুনু। মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া কহিল,—ইনি আমার দাদা, (নামটা বলিবার দরকার নাই) আর ইনি রমা মিত্র।

ছাতাটা তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া নমস্কার করিলাম। এতগুলি মেয়ের মধ্য হইতে একটিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া ফুনু যখন তাহার নামোচ্চারণ করিল, তখন বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাহার মুখের দিকে তাকাইলাম তাহাকে আগে কখনো না দেখিলেও অনেক দিনের চেনা বলিয়া মনে হইল। রমা মিত্রের নাম জানে না বাঙলা দেশের সংবাদ-পত্র-পাঠক এমন কেহ আছেন বলিয়া জানিতাম না। সেই রমা মিত্র গরিব সাহিত্যিকের ঘরে আসিয়া তাঁহার দাঁতন-কাঠি নিয়া সমালোচনা করিবেন জানিলে আমি পূর্বাহ্নে একটা অভিনন্দন-গাথা লিখিয়া রাখিতাম। শাদা গদ্য এখন আমার মুখে জোগাইবে বলিয়া তো ভরসা হইল না।

অধিবাস

রমা দেবীই কথা পাড়িলেন এবং পৃথিবীতে আলাপ করিবার এত সব বিষয় থাকিতেও আমার গল্পের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। প্রথমটা মনে করিলাম বুদ্ধিহিসাবে একটু খাটো বলিয়াই হয়তো অতিথি-সৎকারের ঋণশোধের ইচ্ছায় ভদ্রতা করিয়া আমাকে একটু তোষামোদ করিতেছেন। রীতিটা অতিমাত্রায় ভদ্র ও বহু-আচরিত বলিয়া রমা দেবীর প্রশংসাকে মনে মনে সন্দেহ করিলাম।

কিন্তু দেখিলাম, না; আমার গল্পগুলি লইয়া তিনি দস্তুরমত একটা দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। অন্তঃসারশূন্যতাকে ঢাকিবার জন্য বেশি কথা বলিতে হয় জানিতাম, তবু রমা দেবীকে বিশ্বাস করিতে বড়-সাধ হইল। সাহিত্যিকমাত্রেই প্রশংসার কাঙাল হইয়া থাকে, এবং সে-প্রশংসা যদি দীর্ঘ বক্তৃতাকারে রমা মিত্রের মতন ছাত্র-বন্দিতা দেবীর মুখ হইতে বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে যে একটু ঘামিয়া উঠিব তাহা আর বিচিত্র কি।

গরিবদের নিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি—খুব ভাল করিতেছি। ইহাদের ক্ষুধা, পাপ, ও দুঃখ অনাবৃত করিয়া দেখাইতে হইবে। সুনীতি একটা ব্যাধি—এই ব্যাধি হইতে মুক্ত না হইলে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যও নিষ্প্রাণ হইয়া থাকিবে। ঘটনার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইবার ভীরুতা সাহিত্যিককে শোভা পায় না। এক কথায় রমা দেবী সমস্ত 'বুর্জোয়া' সাহিত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার হইয়া অনুপস্থিত সমালোচকদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলেন। পেটে যাহাদের অন্ন নাই, নিশ্বাসের জন্য বাতাস যাহাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমার সাহিত্য তাহাদের বাণীই বহন করুক।

নূতন অপ্রকাশিত লেখাটা উহাদের শুনাইয়া দিতে ভারি লোভ হইল, গলা খাঁখ্‌রাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রস্তাবটা উত্থাপন করিয়া বসিলাম।

—আজকে আর সময় হবে না, অনেক কাজ আছে। বলিয়া রমা দেবী তাঁহার অনুচারিণীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এটা বলা-ই বাহুল্য হইবে যে, ছাতা লইয়া সেদিন আর 'প্রোমিনেড' করিবার ইচ্ছা হইল না; মেয়েদের রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে আমার প্রতিকূল মতগুলি ঝালাইতে বসিলাম! কাজে কাজেই রমা দেবীর ললাট তেজোব্যঞ্জক, চক্ষু বুদ্ধিমণ্ডিত, দেহশ্রী বিদ্যুদ্দীপ্ত মনে হইতে লাগিল। নারীজাগরণ-প্রচেষ্টায় উহার একগুঁয়েমিকে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলাম না। ফুলুকে ডাকিয়া নানারূপ প্রশ্নাদি করিয়া বহুপরে একটা মোটা খবর লইলাম—রমা দেবী ইট্‌লির ভুবন মিত্রের মেয়ে—যাহার সঙ্গে বাবার কয়েক বছর ধরিয়া একটা মামলা লইয়া ভীষণ মন-কষাকষি চলিতেছে। এটা সুখবর নয়।

খ

ইহার কয়েক দিন পরে দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া নিজ মনে আয়নায় মুখ ভেঙচাইতেছি,—হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি রমা মিত্র। মুখের ভাব স্বাভাবিক করিলাম; এই ব্যাপারটায় যেন বিস্মিত হইবারও কোনো কারণ নাই, কেননা রমা যে একদিন আসিবেন, তাহা আমার জীবনধারণের মতই সুনিশ্চিত,—কেননা রমা দেবী আমার Tenth Muse.

অধিবাস

দুপুরের রোদে মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চুলগুলি রুক্ষ, পায়ে জুতো-ভরা ধূলো, দেহকান্তি শ্রমমলিন। এত সহানুভূতি বোধ করিলাম যে কি বলিব! কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকার চেয়ে একটা চেয়ার টানিয়া তাঁহাকে বসিতে বলাটাই শিষ্টাচার হইবে।

চেয়ারে বসিয়া রমা দেবী কহিলেন,—আপনার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি। অনুরোধ আমার রাখতেই হবে।

শেষের কথাটা বলিয়াই তিনি আমার ল্যাজ মোটা করিয়া তুলিলেন। তবু প্রশ্ন করিলাম,—কি কাজ?

মাথার কাপড়টা দুইবার গুছাইয়া, গলার হারটা বার তিন নাড়িয়া, হাতের চুড়িগুলিতে বার কয়েক আওয়াজ তুলিয়া তিনি কহিলেন,—ছাত্রী-জাগরণ সম্বন্ধে আপনাকে একটা খুব গরম বিদ্রোহাত্মক কবিতা লিখে দিতে হবে।

এই বলিয়া আমার মুখের দিকে এমন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইলেন যে আমি কলম দিয়া একটু ইসারা করিলেই যেন ছাত্রীরা তাহাদের জুতার ঘুন্টি খুলিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইবে। তবু ইতস্তত করিতে লাগিলাম।

মেয়েরা না জাগিলে যে পুরুষের কর্ম্মশক্তিও সুপ্ত থাকিবে, সমস্ত আন্দোলনে পবিত্রতা ও মাধুর্য্য সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য মেয়েদের যে ভীষণ প্রয়োজন এই বিষয়ে যথারীতি এক বক্তৃতা দিয়া, কি কি দিয়া কবিতাটি লিখিতে হইবে তাহার ভাষা ও ভাবের দুয়েকটি ফরমায়েস করিয়া রমা দেবী আমার মুখের দিকে আরেকবার তাকাইলেন।

বাম গুম্ফপ্রান্তটুকু একবার চুমরাইলাম। বন্ধুদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বৃষ্টির দিনে বসন্ত হাওয়া বহাইয়া ও অমাবস্যা রাত্রে চাঁদ ভাসাইয়া দুয়েকটা বিয়ের কবিতা যে না লিখিয়াছি এমন নয়। কিন্তু কাগজে গলা ফাটাইয়া একটা খেউড় ধরিব, আমার না আছে ততখানি স্নায়ুর জোর, না সে শব্দ-সম্পদ! তাই অতি-বিনয়ে ঘাড়টিকে একটু হেলাইয়া অসম্মতি জানাইলাম।

কিন্তু আমার কথা শোনে কে? আমাকে দিয়া না লিখাইলে তাঁহার স্বস্তি নাই। তিনি আরেক কিস্তি আমার প্রশংসা সুরু করিলেন— কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে এবার সন্দিহান হইলেও শুনিতে কিন্তু ভারি ভালো লাগিল।

—আপনি পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন, একশো বার পারবেন। সারা বাঙলা দেশে এমন তেজস্বী লেখনী আর কার আছে?

বলিয়া তিনি কলমটা আমার হাতের মুঠিতে উপহার দিবার জন্য অলক্ষিতে আমার দুইটি আঙুল স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন।

বলিলাম,—ঐ প্রকার উৎকট স্বদেশপ্রেম আমার আসে না।

কথাটার মধ্যে বোধ হয় একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল, রমা দেবীর মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফের বলিলাম,—স্বদেশপ্রেম নিয়ে পৃথিবীতে কোন দিন বড় সাহিত্য হয় নি। আমরা যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

আর যায় কোথা? রমা দেবী এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন জানিলে বাছিয়া-বাছিয়া আরো দুয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দিতাম! রমার রূপে যে এমন দৃপ্ততা ছিল জানিতাম না, দুই চোখে কুলাইয়া উঠিতেছে না।

রমা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, চূর্ণ-কুন্তলগুলি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, শঙ্খের মত গ্রীবাটি বেষ্টন করিয়া যে বস্ত্রাঞ্চলটুকু বুকের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার একটি প্রান্ত মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন,—স্বদেশপ্রেম নিয়ে বড় সাহিত্য হয় নি! নির্জ্জীব ভীরু বাঙালী সাহিত্যিক হ'য়ে তো তা বল্‌বেনই! ভল্‌টেয়ার, ভিক্টর হিউগো, গ্যয়টে, ডষ্টয়ভস্কির নাম শুনেছেন কোনোদিন? আপনাদের মেরুদণ্ড ঘুণে খেয়েছে, তাই সাহিত্য করতে বসে খালি অলস ভাবুকতা, আর ন্যাকামি করে' চলেছেন। স্বদেশপ্রেম নিয়ে সাহিত্য হয় না! সাহিত্য হয় তা হ'লে কি বস্তি নিয়ে, ড্রেনের পচা গন্ধ নিয়ে, মরা ইঁদুর নিয়ে? এ কথা বলতে আপনার লজ্জা হ'ল না? ছি!

হাসিব না কাঁদিব বুঝিলাম না। কাঁচুমাচু হইবার ভাণ করিয়া বলিলাম,—সব গুণই কি সকল লোকের থাকে? কেউ পারে, কেউ পারে না। অন্য মেয়ে পেরেছে বলে' আপনি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হ'তে পার্‌বেন? সকল লোকেরই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে।

এত সংযম সহকারে কথা বলিয়াও কোনো সুফল পাইলাম না। বাম করতলে ডান হাতের মুষ্ট্যাঘাত করিয়া রমা দেবী কহিলেন,—কেন পার্‌বেন না আপনি? আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী না? যদি না পারেন তো কলম ছেড়ে দিয়ে লাঙল ধরুন গে। দেশের উপকার বেশি হবে।

তবুও কিছু কঠিন কথা বলিতে পারিলাম না। মুগ্ধের মত তাঁহার

উজ্জ্বল চোখ দুইটির পানে তাকাইয়া কহিলাম,—বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে-মাতরমের কথা বলছেন ? ওটার মন্ত্রশক্তি যত অমোঘই হোক না কেন, সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে ও গানটা নেহাৎ অসার্থক।

কী সাঙ্ঘাতিক কথাই বলিয়া বসিয়াছি ! যেন তাঁহাকে নিদারুণ দৈহিক অপমান করিয়াছি, এমনি ভাবে সরিয়া গিয়া তিনি আর্ত্ত অথচ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—কী ?

ঘৃণায় কুঞ্চিত হইলে নারীর মুখ এত সুন্দর হয়, এই প্রথম দেখিলাম।

নম্রস্বরে কহিলাম,—আপনি চটছেন, কিন্তু সমালোচনার দিক থেকে কথাটা মিথ্যে নয়। আধা-বাংলা আধা-সংস্কৃত এমন একটা রচনা কবিতার প্রাথমিক নিয়মকেই উপেক্ষা করেছে। তা ছাড়া কবিতাটা নিতান্ত 'কমুন্যাল্,'—মুসলমানরা পড়েছেন বাদ, ব্রাহ্মরা করছেন বিবাদ। বলিয়া হাসিব কি, রমার মুখের চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। রমা দেবী টেবিল হইতে সিসের পেপার-ওয়েইটটা তুলিয়া লইয়াছেন !

—আপনাদের মত ক্ষীণজীবী সাহিত্যিকরা তো এ কথা বলবেই। খালি বিরহ আর হা-হুতাশ নিয়ে শক্তি ক্ষয় করাই আপনাদের বিলাস। দেশকে বিপুলতর গ্লানির মধ্যে ঠেলে ফেলাটাকেই আপনারা মহত্ত্ব মনে করেন। আপনাদের যে ধিক্কার দেব, সে-ভাষা পর্য্যন্ত আমার নেই। বলিয়া পেপার ওয়েইটটা আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া না ছুঁড়িয়াই তিনি খোলা দরজা দিয়া সিধা অন্তর্হিত হইলেন।

রমা দেবী যে আবার এমনি করিয়া অন্তর্হিত হইবেন তাহাও যেন জানিতাম। তাই নিশ্চিন্ত হইয়া আয়নার সম্মুখে দাড়ি কামাইতে বসিলাম।

·গ

এই রমা দেবী কি করিয়া ভদ্র বনিয়া গেলেন ও তাঁহার সঙ্গে কি করিয়া আমার বিবাহ হইল, তাহাই বলিতেছি।

সারা মেয়ে-মহলে রমা তখন একটা উন্মত্ত তুফান তুলিয়া দিয়াছেন! একটা বিদ্রোহাত্মক কবিতা নিজেই লিখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য তাঁর ছয় মাস জেল হইয়া গেল। ভক্ত মহিলাবৃন্দের ফুলের মালা গলায় পরিয়া তিনি কয়েদির গাড়িতে উঠিয়া সকলকে বিনম্র-স্নিগ্ধ নমস্কার করিলেন, এমন একটি পরিতৃপ্তিপূর্ণ পরমসুন্দর মুখ আমি আর দেখি নাই! ভিড়ের মধ্যে আমিও ছিলাম বলিলে আমার প্রেমের কবিতার বইয়ের কাটতি আরো বাড়িয়া যাইবে না, তবু সেই অবাধ্য দৃপ্ত মেয়েটিকে না দেখিয়া কি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব ভাবিয়া পাইলাম না। রমা আমাকে দেখিতে পান নাই।

জেল হইতে ফিরিয়াও রমা সায়েস্তা হইলেন না,—আইনের সঙ্গে আবার খুনসুড়ি সুরু করিয়াছেন। ফের ইহার প্রতিফল মিলিল।

বেলেঘাটায় সেই বন্ধুটির কাছে পুনরায় যাইতে হইয়াছিল। বলা

বাহুল্য এখনও আমাকে ধার করিতে হইতেছে। গিয়া দেখিলাম বন্ধুটি আমার সঙ্গে ঠিকানা লইয়া অত্যন্ত খেলো রসিকতা করিয়াছেন—সদর দরজাটা বিধাতার মতই নিরুত্তর, বধির। প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে-একটা গলির সন্ধান পাইলাম, তাহার নাগাল পাইতে হইলে পূবে আরো মাইল খানেক হাঁটিতে হয়। চৈত্রের রৌদ্র দেখিয়া নিরস্ত হইব অর্থসম্বন্ধে আমার অধ্যবসায় তত শিথিল নয়! কতক দূর অগ্রসর হইয়া সেই শূন্য নির্জ্জন রাজপথে একটি একাকিনী নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া পা দুইটাকে মন্থর করিয়া আনিলাম। দেখি, অনুমান ঠিক, তিনি শ্রীমতী রমা মিত্র।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এখানে?

অল্প একটু হাসিয়া রমা সংক্ষেপে যাহা বিবৃত করিলেন, তাহা এই—কোন একটা রাস্তায় তিনি কি একটা বে-আইনি আন্দোলন করিতে-ছিলেন; তাহার ন্যায্য শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে এইখানে বহন করিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে।

ট্যাক্সিতে বসিয়া রমা দেবী আমার সঙ্গে জল-বায়ু ও বাজার-দর নিয়া কথা বলিতে সুরু করিলেন দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। ট্যাক্সিটা থামাইয়া তাঁহাকে একটা পানের দোকান হইতে লেমনেড খাওয়াইলাম,—তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। বলিলেন,—এমন একটা জায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যাবে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো বোধ হয় এত দিন ধরে' এই ষড়যন্ত্রই করছিল।

কথাটা আমারও মনে হইয়াছিল, কিন্তু বলিবার সাহস হয় নাই।

ট্যাক্সিটা ইটুলিতে তাহাদের বাড়ির দোরগোড়ায় থামিতেই দেখা গেল, ভুবনবাবু ব্যস্ত হইয়া গেটের বাহিরে পাড়ার অনেকগুলি লোকের সঙ্গে জটলা পাকাইতেছেন। (রমার তিরোধানের সংবাদ তাহার কানে পৌঁছিয়াছে!) আমাদের দুইজনকে দেখিয়া ভুবনবাবু ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, এমন বকাবকি আরম্ভ করিলেন যে, ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা পর্যন্ত ভয় পাইয়া দাড়ি চুলকাইতে লাগিল।

আমি যে তাঁহার কন্যাকে একটা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি তাহার জন্য একটি বিনয়-বচন তো শুনিলামই না, বরং আমিও দেশোদ্ধার-রূপ একটা কু-মতলবে রমার সঙ্গে লিপ্ত আছি ভাবিয়া তিনি আমাকেও বাক্যপ্রহার সুরু করিলেন। বোধ হয় এইটুকু সময় রমার সান্নিধ্য-সম্ভোগহেতু আমিও দেখিতে-দেখিতে নিরুপদ্রব মহাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছি,—নহিলে ঐ অতিপ্রগল্ভ হীনমনা ভদ্রলোকটিকে যে কি বলিয়া ক্ষমা করা যায়, ভাবিয়া পাইলাম না। ভুবনবাবুর মতে দোষটা মুখ্যত আমারই। আমিই তাঁহার কন্যাকে ফুসলাইয়া মোটরে দিবাভ্রমণ করিবার জন্যই এমন একটা কাণ্ড পাকাইয়াছি! কদর্থটুকু বাদ দিয়া কথাটা জীবনে সত্য হইয়া উঠুক, এমন-একটা প্রার্থনা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলি সেদিন কান পাতিয়া শুনিয়াছিল বোধ হয়!

ড্রাইভারটা আমার কাছে ভাড়া চাহিতেছে। ও হরি, রমা ও তাঁহার বাবা সেই যে বাড়ি ঢুকিয়াছেন আর ফিরিবার নাম নাই! ভাবিয়াছিলাম কৃতজ্ঞতার ঋণের অর্দ্ধেক শোধ করিবার জন্য ভুবনবাবু আমাকে বৈকালিক জলযোগ করিতে তাঁহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিবেন। এই দুর্দ্দিনে অবশেষে ট্যাক্সি চাপিয়া ভাড়া না দিবার জোচ্চুরিতে

যদি জেল যাই, সেটা ভারি লজ্জাকর হইবে। তাই ড্রাইভারকে হর্ণ বাজাইবার অনুরোধ করিয়া এক ফাঁকে টুক্ করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

পরদিন দুপুর বেলা রমা দেবী আবার আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত—সেই রুদ্র বিজয়িনীর মূর্ত্তিতে। তাঁহার এইবারের বিদ্রোহ শ্লথপ্রাণ দুর্ব্বল সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে নয়, আর কাহারো বিরুদ্ধে নয়, নীচ পচা সমাজের অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি তাঁহার বাবার বিরুদ্ধে। পেপার-ওয়েইট্‌টা সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কথা শুনিয়া গা ঝাড়িয়া একটা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। রমা বলিলেন,—আসুন আমার সঙ্গে, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

চুলগুলি আঁচড়াইবার পর্য্যন্ত সময় পাইলাম না। ট্যাক্সিতে উঠিয়া রমা একটু কাতর-স্বরে কহিলেন,—একজন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে সুহৃদের সম্পর্ক, তা অবধি আমাদের সমাজ বরদাস্ত কর্‌বে না! পুরুষ আর নারীকে একটা সমতল জায়গায় সহজ হ'য়ে দাঁড়াতে দেখলে সকলে কু-অভিসন্ধি আরোপ করবে! এই চরিত্র-দৌর্ব্বল্যকে আমি শাসন করতে চাই। আমি মান্‌বো না এই ইতর অভিভাবকত্ব। চলুন আমার বাড়ি। সত্যিকারের কাজ কর্‌তে হ'লে লোক চাই। এই মরা সমাজকে না ভাঙ্‌তে পারলে নতুন লোক পাব কোথায়? সন্দেহের এই অত্যাচার থেকেই পাপের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি তা কক্‌খনো সইবো না বলে' রাখছি।

রমাদের বাড়ির সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া চা খাইতেছি, এমন সময় আপিস হইতে ভুবন বাবু ফিরিলেন। রমা যেন কায়মনোবাক্যে এই মুহূর্ত্তটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমি যদি সাপ কিম্বা গণ্ডার হইতাম, তাহা হইলেও ভুবনবাবু এতটা চম্‌কাইতেন না। আমার দিকে তির্য্যক গতিতে এমন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যাহাকে বাঙলা ভাষায় তর্জ্জমা করিলে দাঁড়ায় এই,—পাজি হতচ্ছাড়া রাস্কেল! তুমি আবার এসেছ? জানো, ঘাড়ে রদ্দা মেরে তোমাকে এই মুহূর্ত্তে বাড়ির বা'র করে' দিতে পারি?

আমিও দৃষ্টিকে মোলায়েম না করিয়াই তাঁহার দিকে চাহিলাম,— তর্জ্জমা করিলে তার অর্থ হয়—বা'র তো করে' দেবেন, কিন্তু আপনার মেয়ে যে ছাড়ে না!

ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে রমা দেবীর দেরি হইল না। শীতের বেলা, পা-পর্য্যন্ত লম্বা কোটটা কাঁধের উপরে ফেলিয়া খোঁপাটা একটু জুৎ করিয়া বসাইয়া রমা আমাকে কহিলেন,—চলুন, আমাকে বিডন-ষ্ট্রীটের হোষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

সত্য কথা বলিতে কি, পিতার প্রতি এই অবিনীত উপেক্ষা আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি? রমার এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেও ভুবনবাবুর কাছ হইতে মর্যাল্ সার্টিফিকেট্ পাইতাম না; তাই অগত্যা মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিয়া রমার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। ভুবনবাবু স্তম্ভের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া কিরূপ মুখভঙ্গী করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য ঘাড়টা ফিরাইতেও সাহস হইল না।

অধিবাস

ট্যাক্সি সোজা হেদুয়ার পারে না গিয়া রমার আদেশ-মত এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিল। বুঝিলাম, রমার মন চঞ্চল হইয়াছে। হঠাৎ এক সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আপনার সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় রাখছি বলে' আমাকে অযথা বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হ'বে, অন্যায়কে এতখানি প্রশ্রয় আমি কোনকালে দিতে পারবো না। বাবা এখানে শুধু একটা ব্যক্তি নন্—একটা জলজ্যান্ত দুর্নীতির প্রতিনিধি! স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমি তাঁকে অগ্রাহ্য করতে চাই। তা ছাড়া আপনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক—আপনি আজ যতই কেননা উদাসীন থাকুন, একদিন হয়তো আপনার লেখনীই বিদ্যুৎ-লেখা হ'য়ে বহ্নির অক্ষরে সত্যবাণী প্রচার করবে। আমি তা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে' সুখ পাই। আপনি না-ই বা হ'তেন সাহিত্যিক,—তবু একজন পুরুষের সঙ্গে আমি বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারবো না, এ কি জুলুম!

তখন যদি আমি রমা দেবীর বাম করতলখানি প্রথমে ধীরে ও মিনিট দশেক পরে নিবিড়ভাবে ধরিয়া থাকি, তবে আমার সেই সৌহার্দ্দ্যকে অসৌজন্য বলিয়া কেহ মনে করিয়ো না। আর রমা যদি তাঁহার হাত-খানি সরাইয়া না নিয়া পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও তোমরা ক্ষমা করিয়ো।

ঘ

ঘুম হইতে উঠিয়াই রোজ ঝাঁটা-হস্তে চাকরটার সঙ্গে দেখা হয়; সেদিন

চক্ষু কচলাইয়া প্রত্যুষ বেলায় দ্বারপ্রান্তে রমাকে দেখিলাম। Aurora বাঙালী মেয়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে ভবানন্দ বাঁড়ুয্যের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন একটা সঙ্গত উপমা দিতে পারিতাম বটে। কিন্তু রমার মূর্ত্তি দেখিয়া রণ-দেবী চামুণ্ডার কথা মনে পড়িল। নিম-শাখার দাঁতন-কাঠিটা মুখ হইতে খসিয়া গেল।

রমা দেবী দৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন,—বাবা আমাকে বাড়িতে আর স্থান দেবেন না বলেছেন। আমাদের সঙ্ঘের হষ্টেলে এসেই উঠলাম যা হোক। সমস্ত মন দিয়ে এই আমি চাইছিলাম হয়তো। এই আমার বেশ হয়েছে। সংসারে আজ আমার কেউ নেই, এ কথা ভাবতে মুক্তির সঙ্গে আমি একটা বড় রকমের গর্ব্ব বোধ করছি। এবার আমি পরিপূর্ণ ভাবে আমার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবো। তুচ্ছ পরিবারের গণ্ডী আমি মানিনে।

'সংসারে আজ আমার কেউ নেই'—এই কথা বলিতে রমার কণ্ঠস্বর ঈষৎ গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমি যে 'কেউ নেই'-র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নই, তাহা দেখিয়া খুব খুসি হইলাম। পুরুষের সাহচর্য্য ব্যতিত করিয়া একটি অহোরাত্র কাটাইবার সঙ্গতিও মেয়েদের নাই, (কথাটা মেয়েদের পক্ষে অসম্মানসূচক নয়।) বিশেষত যাঁহারা হষ্টেলে থাকেন। তাঁহাদের ফরমায়েস খাটিবার জন্য নানাবিধ কিঙ্করের আবশ্যক। (কথাটা পুরুষদের পক্ষে সম্মানহানিকর নয়।) তবে আমি যে ঠিক রমা দেবীর খিদমৎগারের পর্য্যায়ে পড়িলাম না সেটাকে আমার সিংহরাশির কপালগুণ বলিতে হইবে। দোকান হইতে দর করিয়া শাড়ি ও অর্ডার-মাফিক চটি কিনিয়া আমি রমা দেবীকে লইয়া চাঁদপালঘাটে ষ্টীমার লইতাম

এবং সেই ষ্টীমারেই রাজগঞ্জ হইতে পুনরায় চাঁদপাল ঘাটে ফিরিয়া আসিতাম। সারা সময়টা দেশোদ্ধারের জল্পনা লইয়াই কাটিত না বলিলে তোমরা রাগ করিবে, কিন্তু গঙ্গার হাওয়া যে অধিকতর মধুর এবং সন্ধ্যার আকাশ অধিকতর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত, তাহা হয়তো অস্বীকার করিবে না!

আমাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য অন্তত মা'র স্নেহ-ব্যাকুল বাহু ছিল, রমা তাঁহার মা'র সেই ব্যগ্র বাহুকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন। আমার চেয়ে তাঁহার তেজ দীপ্ততর, এ কথা ভাবিয়া আমিই সর্ব্বাগ্রে বেশি গর্ব্বানুভব করিতেছি। আমরা দুইজনে সমান উৎপীড়িত—একজন সাহিত্যের জন্য, আরেক জন স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য। আমাদের সম্পর্কটা আরও নিকটতর হইয়া উঠিল। দুইটি আদর্শের জন্য পরিবারের কাছে লাঞ্ছনার একটা মিল পাইয়া রমা ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ব্যক্তির চেয়ে একটা ভাবময় আইডিয়াই তাঁহার মনে নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। ঠিক করিলাম আমি করিব সাহিত্য, আর রমা করিবেন শিক্ষা-সংস্কার।

সেই সঙ্কল্প লইয়া তিনি নূতন একটা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। আমাদের জন্য creature comforts নয়; দারিদ্র্য, দুঃখ ও দুরাশা। খুব বড় রকমের একটা সফল জীবনের প্রত্যাশী আমরা নই,—একটি মহান্ আদর্শ হৃদয়ে নিরন্তর লালন করিতেছি সেই আমাদের মহান্ কীর্ত্তি। অর্থ ও সম্মান অনেকেই লাভ করে, আমাদের অকৃতকার্য্যতাই আমাদের জীবনকে একটি মর্য্যাদা দান করিবে।

ইতিমধ্যে হষ্টেলের অপরাপর মেয়েরাও আমাদের সম্পর্ক লইয়া

কানাঘুষা করিতে সুরু করিয়াছে। নেপথ্য হইতে মেয়েগুলি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের যত চেষ্টা করে, রমা দেবী ততই প্রকাশ্যে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরেন। ফলে, হষ্টেলে রমা দেবীকে আর স্থান দেওয়া ছাত্রীদের নীতি-শিক্ষার অনুকূল হইবে কি না এ বিষয়ে সসমারোহে প্রশ্ন উঠিল। রমা সে-লজ্জা আর সহিতে পারিলেন না।

সেই দিন ষ্টীমারে করিয়া রাজগঞ্জ ঘুরিয়া আসিবার ধৈর্য্য ছিল না, ইডেন্-গার্ডেনের বেঞ্চে দুইজনে বসিলাম। কি কি কথা হইয়াছিল ঠিক মনে নাই ; তবে একটু বেশ মনে করিতে পারি, প্রথমত রাগিয়া সমস্ত বাঙলা দেশটাকে রসাতলে পাঠাইয়া পরে কখন্ নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভুলিয়া গিয়া পত্রান্তরালে চন্দ্রোদয় দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছি। রাত বাড়িতেছে, ভ্রমণকারীরা আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ বাড়ি ফিরিতেছে, কেহ বা আড়ালে অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের কাহারও মুখে কথা নাই, আকাশের তারাগুলি নির্নিমেষ চোখে আমাদের দেখিতেছিল। এই প্রকাণ্ড শূন্যময় স্তব্ধতায় দুইজনে আরো কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ট্র্যাম ছিল না ; ড্যালহৌসি স্কোয়ারের কাছাকাছি আসিয়া একটা ট্যাক্সি পাইলাম। কোথায় যাইব, কি ঠিকানা দিব ভাবিয়া পাইলাম না ; ট্যাক্সিটা এখানে-ওখানে ঘুরিতে লাগিল।

রমা দেবীর এই অধঃপতন কল্পনা করিলেও আমার বুক ফাটিয়া

যাইত, তবু জোয়ান অফ আর্কের মৃত্যুর পর করুণ-দৃশ্যের কথা ভাবিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহার মাথাটা কাঁধের উপরে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিলাম। তিনি কহিলেন,—কোথায় যাচ্ছি?

বলিলাম,—কোথাও না।

যাইবার ঠিকানা নাই অথচ যাইতেছি, এমন একটা রূপক লইয়া খুব বড় সাহিত্য-রচনা কোনো দেশে হইয়াছে কি না ভাবিতে লাগিলাম।

পরিচ্ছেদগুলি ছোট হইয়া আসিতেছে।

ছিদাম মুদির লেনে ছোট একটি একতলা বাড়ির একাংশে আমি আর রমা দুইখানি ঘর লইয়াছি। আমি একটা আফিসে সাড়ে তেত্রিশ টাকার একটা চাকুরি লইয়াছি, রমা তাঁহার ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সদ্যপ্রসূত মেয়েটিকে লালন করিতেছেন। রমার শরীর অসুস্থ বলিয়া যে একটা ঠাকুর রাখিব সে সঙ্গতি নাই। বাসন মাজা পোষাইবে না বলিয়া আজ প্রায় চার মাস ধরিয়া কলাপাতায় ভাত খাইতেছি। উনুন আমিই ধরাই, বাজারও আমি করি, মেথর না আসিলে আমাকেই আমাদের অংশের নর্দ্দামাটুকু পরিষ্কার করিতে হয়। দেশ কতদূর অগ্রসর হইল সংসারভারগ্রস্তা রমার তাহা জানিবারও অবকাশ হয় না! সপ্তাহান্তে এক পয়সা দিয়া যে একখানা সাহিত্য-পত্র

কিনিব তাহাও আমার কাছে বাজে-খরচ মনে হয়। তিনটি পয়সা হইলে একবার দাড়ি কামানো যাইবে।

এটা আমাদের পরজন্ম বলিয়া মনে হয়। রমাকে যেন কোনোদিন পাই—কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে শ্রীভগবানের কাছে এমনি প্রার্থনা করিবার ফল মিলিয়াছে! শ্রীভগবান মানুষের প্রার্থনা রাখেন, তাহার এমন জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাইয়া বাধিত হইলাম।

কাল রাত্রে আমাদের বাড়ির অপরাংশের গৃহস্বামীটি কোন্ এক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় গলায় দড়ি দিয়াছেন, —শেষ রাত্রি হইতে তুমুল কান্না সুরু হইয়াছে। ঐ দুঃখব্যাধিজর্জ্জর মৃত ভদ্রলোকটিকে লইয়া একখানা বিরাট মহাকাব্য লেখা যায় না এমন নয়। কিন্তু আমাদের এই নিরর্থক অকৃতকার্য্য জীবন লইয়া কোনো জীবনচরিত-কার মাথা ঘামাইবে না বলিয়া মনে হওয়াতে নিজেই গায়ে পড়িয়া লিখিয়া ফেলিলাম।

পরিবারকে বর্জ্জন করিয়া এই বাড়িতে আসিবার সময় ললিতার ফোটোটি আর আনা হয় নাই—সেই নীচের ঘরের দেওয়ালে সেটি মলিন মুখে এখনও বিরাজ করিতেছে কি না, কে জানে! ললিতা তাহার বিবাহের পরে আমার এক দিদিকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—ওঁকে আমার ফটোটা সরিয়ে ফেলতে বলবেন। যথাসময়ে ললিতার সেই ভীরু অনুরোধটি আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু ললিতার

দুর্বলচিত্ততার কথা মনে করিয়াই ফোটোটি সরাই নাই। আমার চোখের উপর সেই ফোটোটি ধীরে ধীরে দিনের পর দিন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। আমি যে তাহার দিকে কোনোদিন নিবিষ্টচক্ষে তাকাইয়াছি এমন কথাও মনে পড়ে না। তবু তাহার সেই ফোটোটি আজ একবার দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে।

তার পর

আকাশে মেঘ করিয়া আসিল দেখিয়া আর বাহির হইলাম না। এই আসন্নবৃষ্টি প্রদোষকালে আমার ঘরে আসিয়া যদি দক্ষিণের খোলা দুয়ার দিয়া ক্ষণকালের জন্য বাহিরে তাকাও, দেখিবে কে একটি মমতাময়ী বন্ধু একটি শ্যামল সঙ্কেত প্রসারিত করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। মুহূর্তমধ্যে অজস্র ভালোবাসার মত বৃষ্টিধারা নামিয়া পড়িবে, ধানক্ষেতগুলি প্রেয়সীর গভীর ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টির মত সুশীতল ও স্নেহস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। হাত পা নাড়িতে ইচ্ছা করে না, একটা যে সিগারেট ধরাইব দেহে ততটুকু চাঞ্চল্যও যেন সহিবে না, ইজি-চেয়ারটায় পড়িয়া বাহিরে চাহিয়া আছি। স্তিমিত মেদুর প্রদোষালোক কৈশোরের অস্পষ্ট রহস্য-গভীর নব-অঙ্কুরিত প্রেমের মত আমাকে অতি নিঃশব্দে ঘিরিয়া ধরিতেছে।

কিন্তু না, এই আলস্যভোগ আমাকে মোটেও মানায় না। নতুন

অধিবাস

মুন্সেফ হইয়া মফঃস্বলে আসিয়াছি, রায় লিখিয়া-লিখিয়া জীবন আমাকে ঝর্ঝরে করিয়া ফেলিতে হইবে, চেয়ারে বসিয়া থাকিতে-থাকিতে আমিও একদা কঠিন কাঠ বনিয়া যাইব—আপাতত সে জন্যই আমাকে কোমর বাঁধিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কলিকাতা হইতে বেকার সাহিত্যিক বন্ধুরা কি একটা highbrow কাগজ বাহির করিতেছে—তাহার জন্য আমার কাছে লেখা চাহিয়া পাঠাইয়াছে। হাতে মোটে একটা রবিবার আছে,—আজই রাত্রে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে শেষ রাত্রের দিকে নিশ্চিন্ত একটু ঘুম আসিতে পারে।

গল্প লিখিবার মতলবটা মাথায় আসিতেই চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম, একটা সিগারেট ধরাইয়া প্লট্ ভাবিতে বসিলাম। কে একজন সাহিত্যিক নাকি বলিয়াছেন,—গল্প বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহা একেবারেই প্লট্ নয়, আইডিয়া,—তাই আশ্বস্ত হইয়া তখুনিই ফাউণ্টেন্ পেনে কালি ভরিয়া লইলাম। এক পেয়ালা চা খাইয়া লইলে ভাল হইত, কিন্তু শোভাকে ডাকিয়া আবার চা করিয়া খাইতে বসিলে উঁহার সঙ্গে গল্প করিতে-করিতে আসল গল্প লেখা আর হইয়া উঠিবে না। অতএব—

আলোটা নিজেই জ্বালিলাম। বিধাতা সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাহার সমাপ্তির কথা কখনোই ভাবিয়া রাখেন নাই, তাই মহৎ জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও আদ্যোপান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ শূন্য আকাশ হইতে তারার আবির্ভাব সম্ভব হইলেও শূন্য মস্তিষ্ক হইতে ভাব-ভ্রূণের জন্মের আশা নাই,—এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া শোভাকে ডাকিতে যাইব ভাবিতেছি, আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

অধিবাস

ভারি মিষ্টি করিয়া একটি গল্প লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে। শোভাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি স্নেহসুধা দিয়া গল্পের প্রত্যেকটি ছত্র স্নিগ্ধ করিয়া দিব। মনে হয় পৃথিবী যেন ক্রমশ ছোট হইতে-হইতে আমার এই ছোট ঘরটির মধ্যে আসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। আজিকার সন্ধ্যায় কোনো নিরাশ্রয় গৃহহীন জীবিকার্জ্জনের জন্য পথে বাহির হইয়াছে এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না, পৃথিবীতে কয় কোটি লোক আয়ু ও প্রেমের জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা করিতেছে—তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি ? মাটির খুরির বদলে গল্পে সোনার বাটি চালাইলেই গল্প-লেখক হিসাবে আমার সোনার সিংহাসন মিলিবে না এ যুক্তির কোন মানে নাই।

আমার নায়ককে ধনী করিব, মোটর কিনিবার মত অনেক পয়সা তাহার সম্প্রতি না থাকিলেও লোক-বিশেষের জন্য সে কিছু টাকা অপব্যয় করিতে পারে ; (সেদিন যেমন শোভার আবদার রাখিতে গিয়া অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের যতগুলি বই ছাপা হইয়াছে সবগুলিই ভি, পি-তে গ্রহণ করিলাম।) আমার নায়ক জীবনে প্রেম পাইবে, সে সুস্থ, সহজ, সামাজিক। সমাজের বিধি অনুসারে, পৃথিবীর বহু কোটি অপরিচিত কিশোরীর মধ্যে যে একাকিনী মেয়েটি বিনা-দ্বিধায় তাহার প্রসারিত করতলে আপনার স্নেহস্বেদসিক্ত করতলটি উপুড় করিয়া রাখিবে—তাহার পরিচয়ে কী অসীম বিস্ময়, তাহারই মধ্যে সে একটি রহস্যনিগূঢ় কবিতার আবিষ্কার করিবে। সে কাঙালের মত করুণাকণা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে না, বিবাহ তাহার কাছে শুধু বিশ্রাম নয়, নারীর অন্তর্নিষ্ঠ পাতিব্রত্যে সে বিশ্বাসবান।

অধিবাস

মোট কথা, গল্পের রঙ্গতের কথা ভাবিতে গিয়া জায়গায়-জায়গায় খালি নিজেরই ফটো তুলিতেছি। শোভার কাছে গল্পটা ভালই লাগিবে। কিন্তু, যাহাই বল, নিজেকে মুছিয়া ফেলিবার মত ব্যক্তিত্ব এখনো লাভ করি নাই। শুনিয়াছি বিলিতি লেখক গল্সোয়ার্দি নাকি নিজের কথা মোটেই বলেন নাই; তাঁহার মত আমি যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক গল্পেই তাহার বড়াই করিতাম। কিন্তু আমি?—নেহাৎই goody-goody ভালমানুষের মত মুন্সেফি করিতেছি।

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিতেই ঘড়িতে নজর পড়িল। আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহারি মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য্য হইলাম। দেখিতেছি সাহিত্য ও রায়ের মধ্যে আমি কোন তফাৎই রাখিতেছি না। মাসে-মাসে সাহিত্যিক বন্ধুদের কাগজের স্থায়িত্বের জন্য চাঁদা দিব বলিয়াই যদি গল্পটা অমনোনীত না হয় —তাহার মধ্যে কোন আত্মপ্রসাদ নাই। যাহা হউক, আবার কলম ধরিলাম।

শোভা হাতে একটা কাঁসার বাটি লইয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। শোভা আজ নতুন মাংস রাঁধিতেছে—তাই আমার ধ্যান ভাঙিবার মত পর্য্যাপ্ত সময় তাহার হাতে ছিল না। একটা উত্তপ্ত মাংসখণ্ড দুইটি সুকোমল আঙুলে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া

হাসিমুখে শোভা বলিল—দয়া করে জিভ্‌টা বার কর ত, টুপ্‌ করে' ফেলে দি, চেখে দেখ ত, পেটের ভেতর নেবার উপযুক্ত হয়েছে কি না—

মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম—এখন আমাকে বিরক্ত করতে এস না শোভা। রান্না-ঘরে গিয়ে নিজেই চাখ' গে।

একটু অপ্রতিভ হইয়া শোভা আমার টেবিলের কাছে এত নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল যে তাহার খোলা চুলগুলি দুই মুঠিতে ধরিয়া ফেলিলাম। শোভা চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া বলিল—গল্প লিখ্‌ছ? খুব ভাল কথা,—কিন্তু খবরদার,—কারো থেকে টুকো না যেন। এমন গল্প লেখা চাই যা পড়লে মনে হবে মুহূর্ত্তমধ্যে বড়ো হ'য়ে গেছি। বলিয়াই নির্লিপ্তের মত মাংস তুলিয়া-তুলিয়া চিবাইতে-চিবাইতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকালের জন্য কঠিন মাটির উপর নামিয়া আসিয়াছিলাম,—আবার অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ ভরিয়া যিনি তারার পর তারার স্ফুলিঙ্গ ফোটান আমি তাঁহারই সমকক্ষ, —কল্পনার প্রশস্ত রাজপথে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়া গেল; দুই-জনে কালসমুদ্রের কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আর কোন বন্ধন নাই,—হৃদয়ে যাহার স্পর্শ লাভ করিয়া অন্তরে-বাহিরে সুশোভন হইলাম সেই শোভাকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি। শুধু মহাকাশ আমার সঙ্গী—সুদূর বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ। আমি যে মুন্সেফি করিতে একটা জংলি জায়গায় আসিয়া রোজ সকালে কুইনিন্‌ খাইতেছি, কে বলিবে; মাহিয়ানার আশায় মাসের প্রথম তারিখটির সঙ্গে যে আমি প্রেমে পড়িয়াছি আমাকে দেখিয়া তাহা জানিয়া ফেলে কাহার সাধ্য? শত সূর্য্যের মহিমা-মুকুট আমার শিরোভূষণ,—লেখনী আমার নবেন্দুরেখা,—

অধিবাস

অমাবস্যার তিমিরলিপ্ত আকাশ আমার পাণ্ডুলিপি! আর কথা-বস্তু? এই সৃষ্টির হৃদয়পদ্ম—প্রেম!

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে,—তবু লিখিয়া চলিয়াছি; এইরূপ মহৎ উত্তেজনার মধ্য দিয়া রাত্রি প্রভাত হইবে ভাবিতে শরীরটা বীণার তারের মত বাজিতেছে, বাজিতেছে। মনে হয়, আমার হৃদয়ের ভাষা শুনিবার জন্য নিশীথিনী কান পাতিয়া আছে, শোভার মত সে ঘুমাইয়া পড়ে নাই। প্রতিটি মুহূর্ত্তের লঘু অস্ফুট পদধ্বনি শুনিতেছি, আকাশের তারাগুলি যেন প্রতিটি অক্ষরের বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া দিতেছে,—কী অপরিমেয় সীমাশূন্যতা! আশ্চর্য্য,—আমি আকাশচারী দেহহীন প্রাণ—যেন শেলির অস্তিত্বহীন ভাবময় স্কাইলার্ক; শোভার সুকোমল পরশ-উত্তপ্ত সুখশয্যা আমার লোভনীয় নয়—শোভা ত শুধু একটি নম্র তুলসীমঞ্জরীর মত বাঙালি মেয়ে, ক্ষীণা, সচকিতা ভীরু হরিণী!

হঠাৎ পিছন হইতে কে চোখ টিপিয়া ধরিল। চম্‌কাইলাম বটে, কিন্তু চিনিলাম। তবু প্রশ্ন করিলাম—কে?

নম্র কণ্ঠে উত্তর হইল—তোমার সাহিত্যলক্ষ্মী,—আর্ট!

চোখের পাতার উপর শোভার নরম ক্রমক্ষীণায়মান আঙুলগুলির স্পর্শ লইতে লাগিলাম। শোভা কাঁধের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ-করি লেখাটাই দেখিতেছিল, হঠাৎ আমার হাত হইতে কলমটা টানিয়া লইয়া চোখ ছাড়িয়া লেখার নীচে একটা সমাপ্তির রেখা টানিয়া দিতেই অসহায়ের মত বলিয়া উঠিলাম—এখনো যে শেষ হয় নি।

শোভা অভিভাবিকার মত মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—রাত শেষ হ'য়ে এল, এখনো তোমার লেখা শেষ হয়নি ? স্বাস্থ্যটাকেও শেষ করতে চাও না কি ?

কোনো দিন এমন কথা বলি নাই, কিন্তু আজ বলিলাম—ছাই স্বাস্থ্য, ছাই আয়ু, ছাই তোমার বৈধব্য-ভয়,—একটা মহান্ সৃষ্টির কাছে—

শোভা বলিল—তা হ'লেই হয়েছে ! নরোয়েজিয়ান্ সাহিত্যের মত গল্পটাকে তা হ'লে নিতান্তই সেন্টিমেন্টাল্ করে' তুলেছ ! পড় ত, শুনি, কেমন হয়েছে। বলিয়াই শোভা ইজি-চেয়ারটায় বসিল, গা এলাইয়া দিল না।

বলিলাম—সাহিত্যলক্ষ্মী সামনে চোখ রাঙিয়ে বসে' থাকলে কি করে' চলে ? আর্ট ! মাথার ওপর তোমার ঘোম্‌টা টেনে দাও ! অস্পষ্টতাতেই তোমার শ্রী। কিন্তু আমার আর দেরি নেই, একটা প্যারা লিখে ফেল্‌তে পেলেই ইতি। তুমি যেখানে লাইন টেনে শেষ করে' দিয়েছিলে সেখানে থেমে গেলেও চল্‌ত। কিন্তু তখনো sentenceটা শেষ হয়নি, —'তারপর' লিখে শুধু একটা ড্যাস দিয়েছিলাম। ওখানেই থেমে গেলে তোমার অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে গল্পের শেষটার [illegible] সঙ্গতি থাকৃত বটে, কিন্তু আমি ঐ মুদ্রাদোষ পছন্দ করি না।

যাই হোক, শোভার উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়াই আরো কতদূর অগ্রসর হইয়া নিশ্বাস ছাড়িলাম। কাগজের আল্‌গা টুক্‌রাগুলি সব কুড়াইয়া লইয়া একটা পেপার-ক্লিপ লাগাইয়া ঘাড় দুইটা একটু shrug করিয়া বলিলাম—হ'ল শেষ, শুনবে ? কিন্তু তার আগে ল্যাম্পটাকে জাগিয়ে রাখবার জন্ম দয়া করে' কিছু তেল খরচ কর।

অধিবাস

ল্যাম্পে তেল ভরিতে-ভরিতে শোভা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার গল্পটাকে কি করলে ?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিলাম, তবু বলিলাম—তার মানে ? গল্পের পরিণতির কথা বল্‌ছ ? আমার গল্প একটা কমেডি হয়েছে—একটা,—কি বল্‌ব ?—সুরসমন্বয়,—এই সৌরসৃষ্টির মতই পূর্ণাবয়ব !

কথাটাকে যতদূর সম্ভব গৌরবব্যঞ্জক করিয়াই উচ্চারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেন যে তাহা শুনিয়া শোভা হাসিয়া-হাসিয়া কুটি-কুটি হইতে লাগিল, বুঝিলাম না। মনে হইল, কে যেন মুঠি ভরিয়া কতগুলি নক্ষত্রের গুঁড়ো লইয়া ঘরের মধ্যে ছিটাইয়া দিল। আপাতত ঘরে আলো ছিল না, কান পাতিয়া থাকিলে অন্ধকারের দীর্ঘ নিশ্বাস শোনা যায়, তাহারই মধ্য হইতে শোভার কণ্ঠস্বর যেন মৃত্যুর ওপার হইতে আসিতেছে মনে হইল।

—তুমি এই রাত জেগে গভীর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসে' কমেডি লিখেছ ?—ঠুন্‌কো, পল্‌কা ! প্রেমের গল্প নিশ্চয়ই ? বিধাতা আমাকে যদি শুধু দেহশোভা না করে' মূর্ত্তিমতী কবি-প্রতিভা কর্‌তেন ও দু' চোখ ভরে' এত ঘুম না দিয়ে যদি আকাশের অশ্রু দিতেন, তা হ'লে এই রাত্রে আমি একটা প্রকাণ্ড ট্র্যাজেডি লিখতাম, তোমার এস্কাইলাস্ পর্য্যন্ত মাথা নোয়াতেন। হার্ডি যেমন *Dynasts* লিখেছিলেন,—নেপোলিয়নের ব্যর্থতা,—আমিও তেমনি গান্ধির ব্যর্থতা নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ড্রামা লিখতাম। এই কথা শুনে নিশ্চয়ই এবার হাস্‌বার পালা তোমার—না ?

হাসা উচিত ছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে আলো ফের জ্বালা হইয়াছে

দেখিয়া উদ্গত হাসিটা রোধ করিলাম। বলিলাম,—তোমার সেই অসম্ভব ঝালওলা মাংস খাবার আগে তুমি খানিকটা শুনে গেছলে, তার পর থেকেই সুরু করছি। মনে আছে ত' গোড়াটা?

শোভা বলিল—আছে বৈ কি, তোমার গল্পের নায়ক আধ-কবি রজতচন্দ্র একবিংশশতাব্দীর একটি unreal মেয়ের সঙ্গে প্রেমের এরোপ্লেন চালিয়েছে—এই ত? কি নাম জানি মেয়েটির? অরুন্ধতী!—খাসা নাম।

শোভার কথা উপেক্ষা করিয়াই অগ্রসর হইলাম,—শ্রোতার এখানে কোনো ব্যক্তিগত সার্থকতা নাই, শোভা একটা উপলক্ষ মাত্র,—নিজেকেই যেন শোনাইতেছি এমনি ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

'পার্টি শেষ হয়ে গেছে,—ঘর প্রায় শূন্য। পদ্মের কুঁড়ির সঙ্গে পোড়া সিগারেটের টুক্‌রো সতরঞ্চির ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। রজত এখনো বাড়ি যায়নি,—কোথায়ই বা যাবে?—একটা কৌচের ওপর হেলান্ দিয়ে পড়ে' ছিল।

অরুন্ধতী শাড়ি বদ্‌লে এল,—রাতের ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে কোমল নীলাম্বরীটি কবিতার একটা ভালো মিলের মতো ভারি সুন্দর খাপ খেয়েছে। খোঁপায় আর পদ্মকলিকা গোঁজা নয়, অনাড়ম্বর একটি রজনীগন্ধা,—স্নিগ্ধ অন্ধকারে যার গুণ্ঠনোন্মোচন! অরুন্ধতী বল্‌লে—জানি, তুমি এখনো যাওনি, কিন্তু যেতে ত তোমাকে হবে-ই।

রঞ্জত চঞ্চল হ'ল না, ক্লান্ত সুরে বল্‌লে—তবু উৎসবাবসানের পরে এই নিঃশব্দতার মধ্যে একটু বিশ্রাম কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

অরুন্ধতী আর একটা সোফায় বসে' পড়ে' যেন একটু বিরক্ত হ'য়েই বল্‌লে—এইখেনেই তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। আধুনিকতা মানে বিশ্রাম নয়, স্পীড, ভেদ করে' চলে' যাবার মতো একটা দুর্দ্ধর্ষ বেগ। তুমি এমন ভীতু যে একটা সিগ্রেট্‌ পর্য্যন্ত খাও না,—তুমি একটা কী!

রঞ্জত কিছু একটা বল্‌তে যাবার আগেই অরুন্ধতী ফের বল্‌লে—জান আমি কী? আমি একটা আকারহীন নীহারিকা, এখনো রূপ নিতে পাচ্ছি না। কেউ দিতে চায় পৌরুষ, কেউ ঐশ্বর্য্য,—আর তুমি?

অল্প একটু হেসে রঞ্জত বল্লে—হৃদয়।

—হৃদয়? The grand piano? যে monoplaneএ আমি ছুটেছি সেখানে হৃদয়-নামক লাগেজটিরো স্থান-সঙ্কুলান হয় না। অতএব ও-সবে হবে না, রঞ্জত। Be a man!

অরুন্ধতীই ফের বল্‌লে—অমনি বুঝি অভিমানে মুখ ভার কর্‌লে, অমনি বুঝি একটা ব্যর্থ প্রেমের নতুন কবিতা লেখবার জন্য মনে মনে লাইন কুড়োচ্ছ। দাঁড়াও পিয়ানোটা বাজাই। (পিয়ানোতে বসিয়া) কি বাজাচ্ছি বল ত? সেই যে—

What my lips can't say for me
My finger-tips will play for me.

আচ্ছা, এখন ঘরে ত' কেউ নেই, সব নীচে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত, তুমি ইতিমধ্যে নেহাৎ ভালো মানুষটির মতো আমাকে চুমু খেতে পারো? ধর, আমি কেস্‌' কর্‌ব না,—পারো? আমি ত ইথাকার রাজপ্রাসাদে

বন্দিনী পেনিলোপ, তুমি ইউলিসিসের মত আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পার শত পাণিপ্রার্থীর ব্যূহভেদ করে' ? উত্তর দাও, রঞ্জত !"

ইজি-চেয়ারের প্রান্ত হইতে শাড়িটা খস্‌খস্ করিয়া উঠিতেই বুঝিলাম কি-একটা প্রতিবাদ করিবার জন্ম শোভা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম —সস্তা সমালোচনার কসরৎ দেখাতে আগে থেকেই ক্ষেপে যেও না,—পথ বা পাথেয়র চেয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর।

শোভা বলিল—আর কিছু না, একটু ঝিমুচ্ছি। যদি দয়া করে সংক্ষেপে সারো ত তোমার বেচারি সাহিত্যলক্ষ্মীর আর মশার কামড় সইতে হয় না। বিছানায় শুলে আমি কক্ষনো তোমার ঐ অরুন্ধতীর মতো বেয়ারা প্রশ্ন কর্‌ব না। রঞ্জতের মতো তোমার ন্যার্ভাস্ হবার কারণ নেই।

শোভার সকল টিপ্পনিই উপেক্ষণীয়, স্বামীর চাকুরি হইয়াছে দেখিয়া ও বেশ একটু কাজিল হইয়া উঠিয়াছে, তাই আর একটা সিগারেট ধরাইয়া পাতা উল্‌টাইলাম।

"বাড়ি এসে রঞ্জতের ইচ্ছা হয় বই খুলে বসে' রূপার্ট ব্রুকের সনেটগুলি ফের পড়ে' ফেলে,—হাতে কোনো কাজ নেই; কিম্বা ডাউসনের

মত একটা langorous কবিতা লিখলেও মন্দ হয় না। অরুন্ধতীকে ও কিছুতেই ধরতে পারে না, যেন প্রতিপদের চন্দ্রের ক্ষীণায়ু হাসিটি,—অরুন্ধতীই শেলির ইন্‌টেলেকচুয়েল বিউটি, ইয়েট্‌সের ছায়াময়ী প্রকৃতি,—এক কথায় Psyche, যুবক কীট্‌সের। রজত বোঝে, অথচ বোঝা নামাতে পারে না; দুই হাত পেতে মুক্তি ভিক্ষা করতে এসে সেই দুই হাত দিয়েই আঁকড়ে ধরতে চায়।"

শোভা আবার বাধা দিল, কহিল—মোটকথা, তোমার নায়কটি একটি মেরুদণ্ডহীন ম্যানিমিক—এক কথায় যাকে বলে ইডিয়ট্‌। অরুন্ধতী যে প্যাজের খোসা ছাড়ায়, কেরাসিন তেলে আঙুল ডুবিয়ে ল্যাম্প জ্বালে, ওর দেহটা যে একটা বীণাযন্ত্র না হ'য়ে শুধু যন্ত্র—এ বুঝি উনি বিশ্বাসই করতে চান না। তুমি এলিজাবেথান্‌ যুগে জন্মে' কেন সনেট রচনা করলে না?—নাম থাকৃত! By the by, কমেডিটা কোথায়? অরুন্ধতীর সঙ্গে রজতের বিয়ে দিলে? বলিহারি!

বলিলাম,—তা নয়; আচ্ছা বাদ দিয়েই পড়ছি।

—যদি দয়া ক'রে তোমার কাব্যি-করা ভাষাটা ছেড়ে মুখে মুখেই গল্পটা সারো তা হ'লে বসে' বসে' না ঘামিয়ে আরো একটু ঘুমুনো যায়।

অসম্ভব। সুর চড়াইয়া দিলাম।

"* * * কিন্তু অরুন্ধতী যদি এম্‌নিই অদৃশ্য হ'য়ে যেত, সেই অদৃশ্যতার

মধ্যেই রজতের কল্পনা রহস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠত হয় ত'। সে আশাও করেছিল তাই। যে-ফুল ফুটে থাকে, আর যে-ফুল গন্ধ দিতে ভুলে গেছে —এ দুয়ের মধ্যে শেষেরটার প্রতি-ই রজতের পক্ষপাত! তাই অরুন্ধতী যদি হারিত সোম ডি-লিট্‌কে বিয়ে কর্‌ত, তা হ'লেই রজত যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাব্যালোচনায় মন দিতে পার্‌ত, কিন্তু অরুন্ধতী হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে রজতকেই—"

গল্প বন্ধ করিয়া বলিলাম—শুনছ শোভা? তার পর কি হল জান?

শোভা বলিল—ভাগ্যিস্ জানি না। তুমি যদি তোমার পিরিলি বামুনের গলাটা থামিয়ে মুখে মুখেই বল তা হ'লে তাড়াতাড়িও হয়, বাঁচাও যায়!

অগত্যা তাহাই হইল; বলিলাম—রজত ভয় পেয়ে গেল। ওর ধাতে অরুন্ধতীকে বিয়ে করা সইবে কেন? ওর কাছে অরুন্ধতী হচ্ছে ঠুন্‌কো অথচ বহুমূল্য 'ড্রেস্‌ডেন্ চায়না,'—ওর হাত লাগলেই তা ভেঙে যাবে। রজত এই দায় থেকে খালাস পাবার জন্য সুদূর ডিব্রুগড় থেকে একটি গরিব ডাক্তারের মেয়ে বিয়ে করে' আন্‌লে। রজত বেঁচে গেল,— আমারই মত বউর সৌভাগ্যে খাট-গদি না পেলেও একটি ছোট খাটো চাকরি পেয়ে গেল, বেশ সরল গ্রাম্য জীবন নিয়ে সহজ কবিতা লিখ্‌তে লাগল, দিনে-দিনে বেশ গোলগালটি হ'য়ে গেল যা হোক্। দুর্দ্দমনীয়

স্পীডের প্রাবল্যে অরুন্ধতী কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে, একটি ভীরু মেয়ের সঙ্গে একটি সুখনীড় তৈরি করে' রঞ্জত—

শোভা বাধা দিয়া কহিল—সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে লাগলো। এই তোমার কমেডি? বেশ, খাসা। তোমাকে ডেকে সবাই নোবেল প্রাইজ দেয় না কেন? বিলেতে জন্মালে নিদেন পক্ষে এই গল্পের জন্যই হয় ত O. M. পেতে—

গম্ভীর হইয়া কহিলাম—তোমারো তাই মনে হবে যদি বাকিটুকুও শোন। আমি পড়ছি। আর বেশি নেই।

এখন হইতেই অন্ধকার ধীরে ধীরে বিদায়-বেলার প্রিয়া-চক্ষুর মত তরল হইয়া আসিবে, পূব আকাশে শুকতারাটি এখনো জাগিয়া রহিয়াছে. নদীর পারের ঝাউয়ের পাতা দুলাইয়া বাতাস সামান্য একটু কথা কহিল। শোভাকে যে কী অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছে তাহা কোথায় আঁকিয়া রাখিব। বাহুর ক্ষণিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া উহাকে ছন্দের মধ্যে চির-বন্দিনী করিয়া রাখিবার মত যদি আমার কাব্য-প্রতিভা থাকিত, তাহা হইলে আর কথাই ছিল না। ব্রাউনিঙ-ও আমারই মত এমন স্নেহার্দ্র চক্ষু দিয়া শয়ানা ব্যারেট্‌কে দেখিয়াছিলেন কি না কে বলিবে? এস্‌ক্লিপি-য়াডিস্ নাকি বলিয়াছেন—পিপাসার্তের জন্য নিদাঘসন্ধ্যায় তুষার অত্যন্ত মধুর, সমুদ্রযাত্রী নাবিকের পক্ষে বিষণ্ণ শীতের পর বসন্তের ফুল-উৎসব ও উষ্ণতা লোভনীয়, কিন্তু একই শয্যায় একই আচ্ছাদনের নীচে দুইটি প্রেমিক-দেহের তুলনা কোথায়? বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে প্রথম যখন শোভাকে দেখিতে গিয়াছিলাম সেদিন-ও আজিকার মতই মনে সুমধুর ভাব-লাবণ্য ছিল, সেদিন-ও সেই অপরিচিতা মেয়েটিকে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ার

মতই আত্মা দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম;—সৌভাগ্যক্রমে বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই কথাটা ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। আমি তরঙ্গ-ফেনসঙ্কুল নদী না হইয়া এই যে একটি প্রশান্ত স্বচ্ছনীর হ্রদ হইয়া আছি, এ-ই আমার কাছে ভারি ভালো লাগিতেছে। সাফল্যের জন্য ব্যস্ততা নাই, আশা-ভঙ্গের মহত্তর ব্যর্থতাও নাই,—ভারি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। ডেভিসের মত এই Sweet Stay-At-Home আমারও চোখে নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। ছোট সংসার, শোভার ছোট দুটি করতলে আকাশ-ভরা স্নেহ,—শোভা তাহার প্রথম সন্তানটির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কি ভীরু অথচ কি উৎসুক এই প্রতীক্ষা! একটি ভাবী শিশুর সুখকল-হাস্যে গৃহাঙ্গন মুখর হইবে ভাবিতে আমার শরীরেও সুখাবেশসঞ্চার হইতেছে। বিধাতাকে নমস্কার,—আমি এই পরিমিত, সহজস্ফূর্ত জীবন-যাপন ছাড়িয়া একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের মত বাঁচিতে চাহি না।

আমার চেয়ারটা শোভার অত্যন্ত কাছে টানিয়া নিলাম। শোভা কহিল—একটা কথা জিগ্‌গেস করি। এত যে লিখছ, রজত পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে, খায় কি, বিয়ে যে করল তার সঙ্গে ওর বনে কি না, ওদের সংসারে ক'বার মৃত্যু ছায়া ফেল্‌ল, ক'বার আশার পাখী উড়ে গেল, মেয়েটি রজতের কাছে খালি মার্থা, না মেরি-ও—এই সব কিছুই ত ইঙ্গিত করছ না! খালি একটানা সুখের সন্দেশ খাইয়ে খাইয়ে মুখ ফিরিয়ে আন্‌লে। ওগো কবি, তোমার রচনায় একটু দুঃখের সুধা মেশাও,—যে-দুঃখ সৃষ্টিকে সুন্দর করেছে, মহান করেছে। কিম্বা সংসারের ছোট-খাট দুঃখই, যা জীবনকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেয়—যে দুঃখ সয়ে' মানুষ না পায় তৃপ্তি, না পায় অহঙ্কার!

অধিবাস

আমার গলার স্বরটা স্বভাবতই যেন নামিয়া আসিল, যেন আমি কি একটা বেদনার খবর দিতেছি। কণ্ঠস্বরের অনুচ্চতার মধ্যেই বেদনার একটি রহস্য রহিয়াছে। বলিলাম—প্রভাতের পাখী ডেকে না উঠতেই রাতের এই পাখীর গান থামবে।

"অরুন্ধতী তার প্রেমের কন্‌ভেন্‌শন্‌ বজায় রেখেই অবশেষে নীরদ গাঙ্গুলিকে বিয়ে করলে,—নীরদ ব্যারিষ্টার, বিলেতে থেকে স্যাণ্ডেল করে' এসেছে বলে'ই যেন অর্দ্ধ-অবিশ্বাসের সঙ্গে অরুন্ধতী তার টু-সিটার মোটরে গিয়ে বসে' পড়ল। * * *

কে কার খোঁজ রাখে? অতীত স্মৃতি ক্রম-বিলীয়মান ধূপসৌরভের মত,—অরুন্ধতী ও রজতের হাত-ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। দু'জনে বনতও না, অরুন্ধতী যদি হয় আকাশ, রজত নীড়—তাই কা'র কি দুঃখ হ'ল কে জানে, অরুন্ধতী হাতে মোটরের হুইল্‌ নিলে আর রজত নিলে একটি ভীরুকম্পিত প্রদীপ-শিখা!"

একটু থামিলাম। শোভা কহিল—ভারি শ্রান্ত উদাসীন সুর: তার মানে নীরদকে অরু বিয়ে করলে যার প্র্যাক্‌টিস না থাকলেও টাকা বাগাবার ট্যাক্‌টিক্‌স আছে, যে বিলেত থেকে ঘুরে এসেও এখনো 'টাই' বাঁধতে শেখেনি। তারপর?

* * * কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বুঝি অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিমাকাশটা তপস্যা-

নিরতা অপর্ণার দেহাবয়বের মত পাণ্ডুর হ'য়ে উঠেছে। তারিখটা ছিল উনিশে মাঘ, অরুন্ধতীর জন্মদিন। এই মধ্য রাত্রেই সে জন্মেছিল নিশীথ রাত্রের মর্মোচ্ছ্বাসের মত—অরুন্ধতী, গ্রীক্‌দেবী [illegible] চেয়েও মহিমান্বিত, সিথেরিয়ার নিশ্বাসের চেয়েও লঘুচিত্ত। তোমরা হয় ত ভাবছ, রজতের বুঝি তাই ভেবে রাত জাগতে ইচ্ছে হয়েছিল। মোটেও নয়,—এমনিই একটু মনে পড়ে' গেছল হয় ত'। মনে করে' না রাখলেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে—এতে স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট মানুষের হাত কি? কিন্তু সেই স্মৃতি রজতকে অস্থির করে' ছাড়ল না, রজত নুয়ে প[illegible] ধীরে ধীরে তার পার্শ্বশয়ানা শ্লথাবগুণ্ঠা মিনুর ক্ষুদ্র ললাটটি স্পর্শ [illegible]। কিন্তু পরক্ষণেই—"

শোভা যেন একটু চম্‌কাইল মনে হইল। ধীরে আমা[illegible] দুইটি কথার পুনরাবৃত্তি করিল: কিন্তু পরক্ষণেই—হ্যাঁ, তার পর?

অগ্রসর হইলাম।

"কিন্তু পরক্ষণেই দুয়ারে যেন কার করধ্বনি শোনা গেল, প্রথমে মৃদু, পরে স্পষ্টতর। রজত মিনুর ঘুম না ভাঙিয়েই খাট থেকে নেমে পড়ে' নিঃশব্দে দুয়ার খুলে দিল। যেন সে বহুপরিচিত কোন্ প্রত্যাশিত বন্ধুর জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। মেঘের বিছানায় চাঁদ তখন প্রায় মরে' এসেছে, সমস্ত আকাশ শোকাশ্রুসঞ্চিত চক্ষুর মত নিষ্পলক নিরানন্দ হ'য়ে আছে।"

—দুয়ার খুলে রজত কাকে দেখল, জান ?

শোভার চোখ বোজা, অতি ধীরে নিশ্বাস ফেল্‌ছে, যেন অতি কষ্টে বল্লে—জানি ; অরুকে ! কিন্তু তার পর ?

"অরুন্ধতীর সে কী চেহারা হয়ে গেছে, যেন আকাশ-পারের ঐ মুমূর্ষু চাঁদটা,—হতশ্রী, লাবণ্যশূন্য। রজত ত' দেখে অবাক, প্রায় নিশ্চেতন। অরুন্ধতী যেন একটু এগিয়ে এল ; মৃত্যু যদি কথা কইতে পারত এমনি স্বরেই কইত তা হ'লে : তুমি আমাকে একদিন বিনামূল্যে যে জিনিস দিতে চেয়েছিলে, দেবে তা ? তাই নিতে আমি সব ছেড়ে এসেছি, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও অফ্‌স্প্রিঙ্‌। দেবে ?

রজত ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে, কিন্তু এত দূরে এই গভীর রাত্রে রজতের সুখশয্যাগৃহের রুদ্ধ দ্বারে এসে যে করাঘাত করতে পারে তার যে কি অপরিসীম দুঃখ কি ভয়াবহ ব্যর্থতা তা মেনে নিতে কি রজতের যথেষ্ট হৃদয়ানুভূতি ছিল না ? রজত বল্‌লে—না। বড় রাস্তায় পড়লেই ট্যাক্সি পাবেন, বাড়ি ফিরে যান্‌, নীরদবাবুর এখনো ঘুম ভাঙেনি হয়ত'—

বলে'ই রজত দরজা বন্ধ করে' দিলে। তার পর—"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আসিতেছিল বুঝি, অর্দ্ধ পথেই টুঁটি টিপিয়া ধরিলাম। বলিলাম—এই 'তারপরে'র পরেই তুমি শেষ করতে চেয়েছিলে। তুমি যাদেরকে চ্যাম্পিয়ান কর সেই অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতে এই গল্পটা পড়লে তাঁরা কি করতেন ? রজতকে দিয়ে রুপার্ট ব্রুকের মত সেই কবিতা লেখাতেন,—কি জানি সে কবিতাটি—ঘরে ফিরে এসে তাকে দেখলাম, বসে' আছে চেয়ারে, সেই চুল, সেই নোয়ানো ঘাড়, সেই তার দেহবঙ্কিমা,—তার পর ?—না, সব ছায়া, মৃগতৃষ্ণিকা।—'বল

কেমন করে' আর রাত জাগি, আর কি আমার আসে ঘুম?'... হোপলেস্।

শোভা কহিল—তোমার রজত কি করলেন?

বাকিটুকু পড়িয়া ফেলিলাম।

"আজকাল শেষ রাত্রের দিকে বেশ একটু শীত করে' আসে বলে' পায়ের নীচে একটা চাদর থাকে। দরজা বন্ধ করে'ই রজত তাড়াতাড়ি মশারির নীচে ঢুকে চাদরটা গায়ের উপর টেনে দিলে। যেন ও একটি সুরক্ষিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে,—মিনুর দেহ স্পর্শ করে' ওর অত্যন্ত নিরাপদ ও অব্যাহত মনে হচ্ছিল।"

শোভা ক্লান্তস্বরে কহিল—গল্পের কি নাম রাখলে?

—ছায়া। অরুন্ধতী ত' আর সত্যিই আসেনি।

—আসে নি নাকি? খাসা গল্প ত'? আচ্ছা, তার পর?

শোভারই কাছটিতে সরিয়া আসিয়া একটু হেলান দিয়া বসিলাম। বলিলাম—এর আবার তার পর কি?

—তার পর নেই? যে-মিনুর জন্য অরুন্ধতীকে তুমি রজতকে দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, সেই মিনুর জীবনও অরুর মতই অতৃপ্ত কি না তার ইঙ্গিত কোথায়? 'শেষের কবিতায়' বিবাহিত অমিত ও বিবাহিত লাবণ্যর বন্ধুতা না-হয় কবিতার খাতিরে মান্‌লাম, কিন্তু সেই বন্ধুতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কেন? ঘটনার মুখোমুখি কেন দাঁড়াতে শেখনি?

অধিবাস

বলিলাম—ভোর হ'য়ে আস্‌ছে, না শোভা? একটু বেড়াতে যাবে?

আশ্চর্য্য, নিজেই বেড়াতে যাইবার প্রস্তাব করিয়া কখন যে ঐ অবস্থায়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, খেয়াল নাই—জাগিয়া দেখি আলোতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, ল্যাম্পটা এখনো জলিয়া জলিয়া যেন প্রভাতের রৌদ্রকে মুখ ভেঙ চাইতেছে। ল্যাম্প ও রৌদ্র নিয়া মনে মনে একটা রূপক রচনা করিব ভাবিতেছি, মাথায় একটা কঠিন কিছুর স্পর্শ পাইতেই চমকাইয়া চাহিয়া দেখি শোভা ইজি-চেয়ারটাতেই প্রায় উবু হইয়া চিরুনি দিয়া আমার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে,—কখন যে চা হইবে, কখনই বা যে রান্না হইলে কোর্টে যাইব তাহার কিছুই হদিস্‌ নাই। শোভা যে এমন করিয়া আলস্যসম্ভোগ করিতে পারে ইহার আগে ধারণাই করিতে পারি নাই। উহার চক্ষু দুইটির নাগাল পাইবার জন্য মাথাটা উঁচু করিয়া ধরিলাম; মনে হইল উহার চক্ষু দুইটি যেন তৃণাঙ্কুরলগ্ন শিশিরবিন্দুর মত টল্‌টল্‌ করিতেছে—তাহাতেই যেন একটি প্রশ্ন দুলিতেছে: তার পর?

বটতলা

শ্বশুর মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন, দশটা না বাজতে যাবে, আর বাড়ি ফিরবে সন্ধ্যায়। অধ্যবসায় চাই। তা ছাড়া, এ রকম hours রাখলে লোকে ভাববে busy practitioner। প্রথমটা লোকের চোখে একটু ধুলো দিতে হয় বৈ কি। যোগাড়ে হওয়া চাই হে নটবর!

বিবাহের সময় স্ত্রীর বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পণ নিতে হইয়াছিল বলিয়া শ্বশুরের উপদেশ মাথা পাতিয়া নিতে হইতেছে। 'রেস্' খেলিয়া সেই টাকাটা চোঁ করিয়া উড়িয়া গেছে,—কোর্ট কম্পাউণ্ডে বটতলায় সামান্য একটা তক্তপোষ ফেলিবার মত সামান্য টাকা রোজগার করিতে পারিতেছি না। ভাগ্য একেবারে নাজেহাল করিয়া ছাড়িল।

থাকি একটা অপরিষ্কার গলিতে খোলার ঘরে—মিউনিসিপ্যালিটিকে ট্যাক্স দিতে হইবে বলিয়া সাইন্‌বোর্ড টাঙাইবার সাহস নাই; তবু দশটা বাজিতে না বাজিতে মোটা ভাতের সঙ্গে অর্দ্ধসিদ্ধ কতগুলি

আগাছা গিলিয়া হাঁটিয়াই কোর্টে যাই ধুলা খাইতে। নতুন বাহির হইয়াছি বলিয়া পোষাকটা এখনো তেজীয়ান আছে; পোষাক ছিড়িতে সুরু করিলে সিভিল-কোর্টে গিয়া হাই তুলিতে আরম্ভ করিব।

বসিবার জায়গা নাই, বার-লাইব্রেরিটা একটুখানি,—খান বার-চৌদ্দ চেয়ারেই ঘরটা ফুরাইয়া গেছে। চেয়ারগুলি ভাঙা, বসিবার জায়গার বেতগুলি খসিয়া গেছে, দেয়ালে নস্যলিপ্ত সিকনির দাগ, পানের পিক্—দুর্দ্দশার আর সীমা-পরিসীমা নাই। তবু, বার-লাইব্রেরির বাৎসরিক চাঁদা না দিয়াই একদিন লুকাইয়া চেয়ারে বসিয়া এ-জন্ম ও পরবর্ত্তী জন্মের সাধ একসঙ্গে মিটাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বসে কাহার সাধ্য! দুপুরবেলায় রাস্তা দিয়া মহিষ-চালানো বন্ধ করিবার জন্য এত মারামারি, কিন্তু এই যে দিনের পর দিন ঘাসবিহারী হইয়া শুকনো রোদে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুড়িয়া মরিতেছি তাহাতে কাহারো করুণা-সঞ্চার হইবে না।

অনেকেই গাছতলায় তক্তপোস পাতিয়াছে—তাহার উপর একখানা ছেঁড়া মাদুর ও একটা কাঠের বাক্স,—সব মিলিয়া ইহাকে সেরেস্তা বলে। নানারকম পোষাক পরিয়া এই তক্তপোষের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে মক্কেলের আশায়; কোন লোক খালি-পায়ে ও ময়লা কাপড়ে তক্তপোষের কাছে একটু আসিয়া পড়িলেই উকিলদের আনন্দে হৃৎস্পন্দন সুরু হয়—সারি-সারি সেরেস্তায় সাড়া পড়িয়া যায়, দালালরা আসিয়া শবলুব্ধ শকুনের মত মক্কেল লইয়া কামড়াকামড়ি করিয়া পরস্পরকে কখনো কখনো বিবস্ত্র করিয়া ফেলে। দেখি, আর 'মা জগদম্বা' বলিয়া হাই তুলি।

সকালে টিউশানি সারিয়া কোর্টে আসিয়াই টুপিটা একটা পানের দোকানে জিম্মা রাখিয়া এখানে সেখানে চষিয়া ফিরি। সেদিন দেখিলাম বাদামতলায় কে একটা সন্ন্যাসী যথারীতি পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়াছে; পেণ্টুলান্‌টা গুটাইয়া তাহার কাছে বসিয়া পড়িয়া হাত দেখাইলাম। আমার হাতে নাকি বুধ স্থানে চক্র আছে, এ-চিহ্ন নাকি একমাত্র নিউটনের হাতে ছিল; হাইকোর্টের জজ্‌ আমাকে হইতেই হইবে, আজ এরকম ভাবে না হয় খুঁটিহীন গরুর মত ঘুরিয়া মরিতেছি, কিন্তু আমাকে না হইলে এত বড় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যটাই চলিবে না। মনে মনে একবার শেষ পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিলাম—এক সুরেন্ মল্লিকের সঙ্গে দেখা হইল! ইচ্ছা হইল গণকঠাকুরকে একটা পেন্নাম ঠুকিয়া দিই। যাই বল, লোকটার চেহারায় একটা দীপ্তি আছে, কথাগুলি গম্ভীর, মোটেই ছ্যাবলা নয়—এমন প্রশস্ত কপাল খুব কম লোকেরই দেখা যায়। শেইরো ইঁহার পায়ের তলায় বসিয়া রেখাবিচার শিখিয়া গেলে ভালো করিত। নটবরের সঙ্গে নিউটনের নামেরও চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে। রীতিমত লাফাইয়া উঠিলাম।

থার্ডক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গিয়া বসি। ছোটখাটো নানারকম 'কেস্‌' হয়,—শুনিতে শুনিতে মনটা গিস্‌গিস্‌ করিয়া উঠে। ইস্, আমি যদি এই ঠোঁট-কাটার মোকদ্দমাটা পাইতাম তবে ইংরেজি বুকনিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে হাঁ করিয়া দিতাম নিশ্চয়! উকিলগুলি শুদ্ধ করিয়া ইংরেজি পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছে না, থামিয়া থামিয়া বাঙলা ঢুকাইয়া কথার পারম্পর্য্য রাখিতেছে; ম্যাজিষ্ট্রেটও তথৈবচ, সাক্ষীর জবানবন্দী অনুবাদ করিতে প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটা করিয়া sequence of tenseএর

ব্যাকরণ-ভুল। পয়সা চাই না, যদি একবার একটা মোকদ্দমা অন্তত হাতে পাইতাম—ঐ বি-এ ফেল্ ম্যাজিস্ট্রেটকে ঠিক হইয়া বসিতে দিতাম না।

নটবর বিশ্বাসের আয়ুই ফুরাইতে লাগিল—এখনো ওকালতি-সমুদ্রের পারে বসিয়াই নিউটনের সঙ্গে যাহোক্ করিয়া যোগসূত্র রক্ষা করিতেছি। ঘরে গৃহিণী যেমন সতীত্ব-পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন না, বলিয়াই চিরকাল পতিব্রতা রহিয়া গেলেন, তেম্নি আমিও একমাত্র সুযোগের অভাবেই রাসবিহারী ঘোষের পরিত্যক্ত সিংহাসনটা অধিকার করিতে পারিলাম না বোধ হয়।

যাই হোক্, যে গণকের চেহারায় ভাস্বর দীপ্তি দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎও অনুরূপ উজ্জ্বল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সেই গণকই আরেকদিন একটি লোককে দেখাইয়া দিয়া আমাকে বলিল—একে তোর বাহন কর্, স্বর্গে নিয়ে যাবে।

ষাঁড় চড়িয়া শিব স্বর্গে গিয়াছিলেন জানি, কিন্তু উদ্দিষ্ট লোকটির সঙ্গে বলিবর্দ্দের কোনই সাদৃশ্য দেখিলাম না। লোকটা যেমন ঢ্যাঙা তেমনি কাহিল,—ষাঁড় না বলিয়া সাঁড়াশি বলা যাইতে পারে। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি প্রায় পায়ের পাতার উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কানের পিঠে বিড়ি গোঁজা, পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু পায়ে। পা দুইটা একত্র জোড় করিয়া কোমরটা নীচু করিয়া দিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইবার একটা ভঙ্গি পেটেণ্ট করিয়া নিয়াছে যে লোকটাকে সাঁড়াশির সঙ্গে তুলনা করিতে বেগ পাইতে হয় না। আমার দিকে চাহিয়াই উহার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নীচের পুরু ঠোঁটটা ঝুলিয়া

পড়িল ও সেই অবকাশে অধরান্তরাল হইতে যে দাঁতগুলি আত্মপ্রকাশ করিল সেই দাঁতের কথা ভাবিয়াই ছেলেবেলা রীতিমত ভয় পাইয়াছি। এখনো মনটা একটু ছাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু মক্কেলের চেহারা-বিচার করিলে চলে না।

লোকটি আমার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আঙুল নাড়িয়া কহিল,—হবে। আপনার হবে।

নিজেই অগ্রসর হইলাম। বলিলাম—নিশ্চয়ই হবে। কি তোমার মোকদ্দমা, ম্যাজিষ্ট্রেট এসে বসেছে, টাকা দাও, ওকালত-নামা আর ডেমি কিনে আনিগে। বলিয়া সত্যসত্যই হাত মেলিয়া ধরিলাম।

লোকটা নড়িল না। তেমনি নীচের ঠোঁটটা ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিল,—হবে, এই ত' চাই। ভয় নেই কিছু আপনার। কোথায় থাকেন আপনি?—নীচের ঠোঁটটা দাঁতের সঙ্গে ঠেকাইয়াই প, ব ও ভ উচ্চারণ করিল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—কোথা থাকি সে খোঁজে তোমার লাভ নেই। মামলা করতে এসেছ? তা হ'লে আর দেরি কোরো না। দেরি হলে' পেস্কারকে ডবল দিতে হবে।

লোকটা তেমনি উদাসীন থাকিয়াই কহিল,—চলুন ঐ ট্রেজারির কাছে, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

লোকটাকে অনুসরণ করিলাম। লোকটা একটা জায়গায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া কহিল,—আমি মশাই টাউট, দালাল—আপনাকে মোকদ্দমা এনে দেব।

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।—এনেছ?

—ব্যস্ত হবেন না। কদ্দিন বেরুচ্ছেন?

—মাস ছয়েক।

—পেয়েছেন একটাও?

—না।

—কি করেই বা পাবেন? পাওয়ার-হাউস্ না থাকলে কি আর বাতি জ্বলে? কি করছেন তা'লে য়্যাদ্দিন?

—যাই আর আসি। কখনো কখনো পাঁচটা পর্য্যন্ত টিকতে পারি না। মিড্ ডে ফেয়ারে তিন পয়সা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরি।

লোকটা তাহার পেটেন্ট ভঙ্গিতে শরীরটাকে স্থাপন করিয়া কহিল,—ভয় নেই আপনার, আপনার খোলার বাড়ি দালান করে' ছাড়ব। সব 'পেটি' কেস আমার হাতে, পেটি কেস করে' হাত আগে মক্স করে' লিন্, পরে সেসন্স্ কেস্ পাবেন। এভিডেন্স্ য়্যাক্টটা ফের ভালো করে' পড়ে' লেবেন।

লোকটার উপর রাগ হইল বটে, কিন্তু প্রকাশ করিতে সাহস হইল না। কহিলাম,—মোকদ্দমা তুমি এনে দাও, পয়সা আমি চাই না, আমি একবার দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাই। এই সব পুঁচকে উকিলদের জন্যে সিক্স্থ ক্লাশের ইংরিজি আমি একবার দেখে নেব।

—আলবৎ লেবেন। একটা সিগ্রেট্ খাওয়ান ত? বলিয়া, লোকটা বেমালুম আমার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

আত্মসম্মানে বাধিল বটে, কিন্তু উহার হাতটা ঘৃণায় নামাইয়া দিলেই বা রাতারাতি কোন্ রাজ্য মিলিবে? উহাকে পান ও সিগারেট্ কিনিয়া দিলাম। লোকটা বলিল,—ঐ যে রামেন্দ্র বাবু দেখছেন লাট্টুর মত

কোর্টে কোর্টে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওর পসারটা কা'র জন্যে হ'ল? এই বাঁড়ুয্যের জন্য। বার আনা চার আনা হিসেব। চার টাকা ফি হ'লে আমি নিতাম তিন টাকা; এই করে' না লোকটা আজ ময়ূরপুচ্ছ গজিয়েছে! গণকঠাকুরের সুপারিশে বাঁড়ুয্যের জন্য উকিলদের মধ্যে কত বার ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'য়ে গেছে। নস্য আছে?

আরেক জনের কাছ হইতে নস্য চাহিয়া বাঁড়ুয্যেকে দিতেই বাঁড়ুয্যে তাহা পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিল। বলিল,—বেশ। কিছু ভাববেন না আপনি, আমি যার ভঁরসা, ভাঁড়ে তার ফুটো হয় না। কিন্তু পাঁচটা টাকা যে দিতে হবে। একটা তক্তপোষ পেতে সেরেস্তা করতে না পারলে ত আর ইজ্জৎ থাকবে না। মক্কেল এলে কোথায় তাদের বস্‌তে দেবেন? আপনার গদি বলে' কোন্‌টা তারা চিনে রাখবে বলুন। ঘুরে বেড়ালেই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেড়ে না, মশাই।

বুঝিলাম এতদিন সেরেস্তা করা হয় নাই বলিয়াই এত পিছাইয়া রহিয়াছি। লোকটা ফের বলিল,—উকিলের শুধু দুটো জিনিষ চাই মশাই, ঠাট্ আর ঠোঁট। বেশ, দিন্। কালই এনে রাখব।

বলিলাম,—সঙ্গে ত এখন নেই, বাঁড়ুয্যে। কাল আমার বাড়ি যেয়ো। উহাকে ঠিকানা দিয়া দিলাম। কোমর বাঁকাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কহিলাম,—রামেন্দ্র বাবু প্রথম প্রথম তবু চার আনা নিয়েছেন, দু' আনাতেই আমার চল্‌বে। আমাকে গুচ্ছের মোকদ্দমা এনে দাও ভাই।

দাঁত দিয়া ঠোঁটের সঙ্গে 'ব' উচ্চারণ করিয়া বাঁড়ুয্যে ঘাড় দুলাইতে দুলাইতে বলিল,—হবে, হবে। নিশ্চয়ই হবে।

অধিবাস

বাড়ি ফিরিবার সময় পোষ্টাপিসের কাছে রামেন্দ্রবাবুকে যাইতে দেখিলাম। সনদ লইবার পরে শ্বশুর মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর কাছে আমার এক পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন, আমি বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। রামেন্দ্র বাবু আমার মুখের দিকে শ্যেন-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—চিটিং ডিফাইন্ কর ত ছোক্‌রা। কথা শুনিয়া শুধু ঘাবড়াইলাম না, রীতিমত অপমানবোধ করিলাম। তখনো পয়সা-রোজগারের নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনায় আত্ম-সম্মানকে ডালি দিই নাই। চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিলাম,—পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাবেন, বুঝিয়ে দেব।

পরে মনে হইয়াছে চটিয়া ভাল করি নাই। কত জুনিয়ারই ত দিব্যি রামেন্দ্রবাবুর দৈনিক বাজার-সওদা করিতেছে, একজন মাগনা তাহার ছেলেকে কোচ করে, সেদিন কোর্টে রামেন্দ্রবাবুর মোজা খুলিয়া গেলে একজন তাঁহার গার্টার লাগাইয়া দিয়াছিল! কায়স্থের সন্তান হইয়া দুর্ব্বাসার অনুকরণ করিতে গিয়া এখন দুর্ব্বার চেয়ে আর বেশি কিছু আশা করিতে পারিতেছি না। যাই হোক্, সামনে রামেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া মনে মনে রাস্তার উপর লাথি মারিলাম। কোনো মোকদ্দমায় রামেন্দ্র-বাবুকে বিপক্ষে পাইবার দিন এইবার ঘনাইয়া আসিতেছে। চাঁটিং মারিয়া 'চিটিং' কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিব।

বাড়িতে আসিয়া দেখি কমলা বিছানা পাতিতেছে। অর্দ্ধপ্রস্তুত

শয্যার উপরে কোর্টের পোষাকে বসিয়া পড়িয়াই কমলাকে আদর করিতে সুরু করিলাম। জীবনে কি নবীন সৌভাগ্যোদয় হইল, এই খোলার ঘর কি করিয়া ধীরে ধীরে পাঁচ তলায় উন্নীত হইবে তাহারই ব্যাখ্যাবর্ণনা চলিতে লাগিল। নতুন উকিলের পক্ষে টাউট পাওয়াই যে নিশ্চিত সাফল্যের সূচনা, টাউট কাহাকে বলে, কি করিয়া অন্যের মক্কেল ভাগাইয়া আনিতে হয়, খপ্পরে আসিয়া পড়িলে কি করিয়া মক্কেলদের বিবস্ত্র করিয়া ট্যাঁক উদ্ধার করিতে হয়, বোকাটে ধরণের দেখিলে কি করিয়া সামান্য জাজ্‌মেণ্টের নকল নিতে হইলে ফি আদায় করা যায়—আমার শ্বশুরের অর্ব্বাচীন কন্যাটিকে বুঝাইতেই দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সারা রাত্রি শুইয়া শুইয়া কমলের গায়ে মনে-মনে গয়না গড়াইয়া দিতে লাগিলাম।

সকালবেলা বাঁড়ুয্যে আসিয়া হাজির। কমলাকে বলিলাম,—তোমার কাছে পাঁচ টাকার একটা নোট আছে, বার করে' দাও তো।

কমলা কহিল,—এই মাসের শেষ সম্বল তা জান?

মুসোলিনীর মত দৃপ্তকণ্ঠে কহিলাম,—উপোস করব। দাও টাকা।

টাকা হাতে দিয়া কমলা কোমল করিয়া একটু হাসিয়া কহিল,—কই আনবে, না ঘরের টাকা বার করে' দিচ্ছ।

ইকনমিক্সের ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্ যে শিখে নাই তাহার সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা হইল না। তবু বাঁড়ুয্যের হাতে মাসের শেষ সম্বল

এই পাঁচ টাকার কাগজটুকু গুঁজিয়া দিবার আগে একবার বলিতে ইচ্ছা হইল: পাঁচটাকাই কি লাগবে? কিন্তু জিহ্বার ডগাটা বার কয়েক চুলকাইয়াই ক্ষান্ত হইলাম, বলা হইল না। এমনিই ত' কাল কোর্টে বাঁড়ুয্যের কাছে নিজের হাঁড়ির কথা বাহির করিয়া দিয়াছি, মিড-ডে ফেয়ারে যে বাড়ি ফিরি বোকার মত তাহাও বলিয়া বসিয়াছি, উহারই সামনে পেণ্টালুনের পকেট হইতে আধপোড়া সিগারেট বাহির করিয়া ফুঁকিতে সঙ্কোচ করি নাই; আজ সকালে নবজীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে এই দীনতা না দেখাইলেই চলিবে। মহশীনের মত টাকাটা এমনভাবে বাঁড়ুয্যের হাতে গুঁজিয়া দিলাম যেন আমার বাঁ হাত পর্য্যন্ত জানিতে পারিল না।

কোর্টে আসিয়া দেখি বাঁড়ুয্যে ঠিক তক্তপোষ পাতিয়া বসিয়াছে। নেহাৎই ডেমোক্রেটিক্ যুগে বাস করিতেছি, নহিলে বাঁড়ুয্যের পদধূলি মাথায় লইতাম। এতক্ষণ মিছামিছি বাঁড়ুয্যের সাধুতায় অবিশ্বাস করিতেছিলাম; বাঁড়ুয্যের তিরোধানের পর সারা সকাল বেলাটা কমলা আমাকে বাঙাল, বোকা, অজবুক বলিয়া গালমন্দ করিয়াছে, হাই-কোর্ট দেখাইয়া পাঁচটা জলজ্যান্ত টাকা খসাইয়া লইয়া গেল, আর আমি ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে তাহাই হজম করিলাম! সত্যই, শোপেন-হাওয়ার যে মেয়েদের একান্তরূপে সন্দিগ্ধ, অসাধু ও চরিত্রহীন বলিয়া রায় দিয়াছেন তাহাতে আমার মন সুস্পষ্টস্বরে সায় দিয়া উঠিল।

বাঁড়ুয্যে বলিল,—বসুন।

আঃ, বহুদিন পরে বটতলায় বসিতে পাইলাম। দশাশ্বমেধঘাটে এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম পাঁচ বৎসর ধরিয়া সমানে দাঁড়াইয়া আছে,

এমন শাখাপত্রবহুল বৃক্ষতলে একটি সতরঞ্চিসমাবৃত তক্তপোষ পাইলে সন্ন্যাসী ঠাকুরও বসিয়া পড়িয়া এমনি আরামে 'আঃ' করিতেন; পাঁচ বৎসর দাঁড়াইবার কসরৎ করিয়া এখন বসিতে তাঁহার লজ্জা করিতেছে।

বাঁড়ুয্যে ছুটিয়া কোথা হইতে একটা কাগজ আনিয়া সামনে ধরিল, কহিল,—একটা সই করে' দিন্ শিগগির।

কাগজটা মনে হইল ওকালতনামা, কায়দা করিয়া সই করিয়া দিলাম। হাতের লেখাটা ইচ্ছা করিয়াই অপরিষ্কার করিলাম, হাতের লেখা অপাঠ্য করাই বড় উকিলের চিহ্ন। নাম-সইর দাম দুইটাকা জানিতাম, বাঁড়ুয্যে সাড়ে বারো পার্সেন্ট হিসাবে আমাকে চার আনা আনিয়া দিল। ভাবিলাম সসাগরা ধরিত্রীই যখন হস্তচ্যুত হইল তখন এই সূচ্যগ্র ভূমিটুকুই বা রাখি কেন? কিন্তু চার আনা পাইয়াছি এ কথা কেই বা জানিতে আসিবে, বরং নিশ্চিন্ত হইয়া এক বাক্স সিগারেট্ ফুঁকিতে পারিব! কোন কোন উকিল ত ফি বাবদ আলু বেগুনও নিয়া থাকে, আমিই বা এমন কি সেকেন্দর শা আসিলাম। গণক ঠাকুর বাঁচিয়া থাকুন, কে জানে এই দস্তখতের জোরেই হয় ত একদিন হতচ্ছাড়া ভাগ্যটাকে নাকখত দিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া দিব।

বলিলাম,—বাঁড়ুয্যে, মক্কেল? ডাক পড়বে ত!

বাঁড়ুয্যে এক গাল হাসিয়া বলিল,—মক্কেল নেই তার আবার ডাক! ঐ বুড়ো লোকটার কাছ থেকে দুটো টাকা আদায় করা গেল। লোকটা একটা বন্দুক শিল্ করিয়ে নেবে তারই অজুহাতে একটা ভাঁওতা মেরে সই করে' দু'টো টাকা আদায় করে' নিলাম। ঐ কাগজ নিয়ে দপ্তর-খানায় গেলেই বন্দুক শিল্ হবে—ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি। ওটা বুঝি

ওকালত-নামা, ও ত একটা দু আনা দিস্তের কাগজের একটা তা। ওকালত-নামা চেনেন না?

সত্য কথা বলিতে কি, তবু সিকিটা ঘৃণায় পথের ধূলায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না, পেণ্টুলানের পকেটে হাত ঢুকাইয়া বারে-বারে তাহার বক্রাকৃতি ধারগুলি অনুভব করিতে লাগিলাম। বলিলাম,— লোকটা যদি ফিরে আসে?

বাঁড়ুয্যে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—আসুক না', ফিরে এলেই ত ফের আপনার চার আনা আসবে। ফি-ছাড়া একটিও দাঁত ফোটাবেন না যেন। বলিয়া বাঁড়ুয্যে ফের উপদেশবর্ষণ করিতে সুরু করিল। কহিল,—পোষাক বদলাতে না পারেন দু'দিন অন্তর টাইটা অন্তত বদলে আসবেন মশাই। আর বেশ ক্লিন্ শেইভড হবেন, বুক-পকেটের রঙচঙে রুমালটা বার করে' রাখবেন একটু, আর একটা রুমাল কোটের বাঁ হাতায় ঢুকিয়ে রাখবেন, বুঝলেন? সেটা দিয়ে মুখ মোছা চল্‌বে।

চার আনা রোজগার করিয়াছি বলিয়া দুঃখ নাই, কিন্তু মক্কেলটা ফস্‌কাইয়া গেল, তাহার হাত ধরিয়া এজলাসে উঠিয়া বক্তৃতা করিতে পারিলাম না, লর্ড সিংহের সিংহনাদই অবিনশ্বর রহিয়া গেল ইহার জন্যই কপাল কুটিতে ইচ্ছা হইল। জীবনের এতগুলি বৎসর বি এল-এ রে করিয়া কাটাইয়া দিলাম, তাহার মধ্যে কোনদিনই প্রতীক্ষার স্বপ্ন দেখি নাই; আজ মক্কেলের একখানি মুখ দেখিতে পাইলে কৃতার্থ হইতাম। সে-মুখ রোগে মলিন, পাপে কলুষিত, বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হউক, ক্ষতি নাই, সে-মুখ কমলার মুখের চেয়ে সুন্দর!

অধিবাস

মাসের প্রথম তারিখে বাঁড়ুয্যে সরাসরি আসিয়া আমার কাছে হাত পাতিয়া কহিল,—গেল-মাসের মাইনেটা আমার চুকিয়ে দিন।

তক্তপোষে বসিয়া প্রতিবেশী উকিলের কার্য্যকলাপ মুখস্ত করিতে-ছিলাম, বাঁড়ুয্যের কথা শুনিয়া সেই তক্তপোষ-শুদ্ধ মাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কহিলাম,—তোমার আবার মাইনে কী!

—মাইনে না? বাঁড়ুয্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—তবে মিছিমিছি আপনার জন্যে এতদিন খাটলাম কেন?

রীতিমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম,—খাটলে আবার কোথায়? এ পর্য্যন্ত একটা মোকদ্দমাও জোটাতে পারলে না।

—মোকদ্দমা কি মাগনা আসে নাকি, মশাই? এই যে আপনাকে এতটা পথ এগিয়ে আনলাম সে কি শুধু শুধু? আপনি মোকদ্দমা পাবেন না সে-জন্যে আমাকে ভুগতে হ'বে? এ মজা মন্দ নয় দেখছি।

নরম হইয়া বলিলাম,—মাম্‌লা আনলেই ত পয়সা পাবে।

মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বাঁড়ুয্যে কহিল,—সে-মাম্‌লা কষ্ট করে' আপনাকেই বা দিতে যাব কেন? আপনি কি আমার বেয়াই না শ্বশুরঠাকুর? আপনার দু'টাকা ফি-এ আমার কি এমন কমিশান্ হ'বে? দিন্, দিন্, মাইনেটা চুকিয়ে দিন্ মশাই।

নিরুপায় হইয়া বলিলাম,—না। যেখানে খুসি তুমি যাও, যাকে ইচ্ছে মাম্‌লা এনে দাও গে। আমার কাছে কিছু হ'বে না।

আচ্ছা।—

বলিয়া বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেল। মুখ-চোখের এমন একটা ভাব করিল যেন সে আমাকে দেখিয়া নিবে। কিন্তু আমি উকিল—সে-কথা হয়ত সে ভুলিয়া গেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। যাহাই বলি, শূন্য হাতে আজ বাড়ি ফিরিতে বুকটা আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। লোয়ার সার্কুলার রোডের কাছে একটা গলিতে কাবুলিদের একটা আড্ডা আছে জানিতাম। তাহারই অভিমুখে রওনা হইলাম। একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়া দশ টাকা ধার করিয়া আনিয়া কমলার সেমিজের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া হাত দুইটা ধরিয়া বাধা দিয়া কহিলাম,—এক্ষুনি খুলো না, খানিকক্ষণ বুকে করে' রাখ।

কমলার মুখ সুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল—টাকা পেলে?

বীরের মত কহিলাম,—নিশ্চয়। ওর স্পর্শ তোমার শ্রীকরপদ্মের চেয়ে মোলায়েম।

টাকা দেখিয়া কমলা একেবারে ভাগ্যগার হইয়া উঠিল। আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনর্গল চুমা খাইতে লাগিল। কহিল,—পাড়ার পাঁচ-জনকে আজ নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করে' খাওয়াব। দুটো টাকা ভাঙিয়ে আমার সিন্দুরের কৌটায় রেখে দেব—তোমার প্রথম রোজগারের টাকা!

পাড়ার পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সবে বাড়ি ফিরিয়াছি, বাঁড়ুয্যে

হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। কহিল,—একটা মোকদ্দমা পাওয়া গেছে, শিগগির চলুন। মোটা টাকা মিলবে।

কিছু একটা সন্দেহ যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু মোকদ্দমা যখন সত্যিই পাওয়া গিয়াছে তখন মিছামিছি সন্দেহ করিয়া লাভ কী!

উৎফুল্ল হইয়া কহিলাম,—কোথায়?

—চলুনই না।

বলিলাম—এ কেমন ধারা বাঁড়ুয্যে। মক্কেলরাই ত উকিলের বাড়ি আসে, উকিল কবে মক্কেল শিকারে বেরোয়!

বাঁড়ুয্যে কহিল,—সে সব নিয়ম উল্টে গেছে। চলুন, দেরি করলে অন্য লোক ছিনিয়ে নেবে। দাঁও ফস্‌কে যাবে কিন্তু। এই টাকাটা থেকেই আমার পাওনাটা তুলে নিতে হবে—কি বলুন!

বাগবিস্তার না করিয়া জামা কাপড় পরিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। কমলা কোমরে কাপড় জড়াইয়া এক রাশ বাসন পত্র লইয়া রান্নায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম,—আরেকটা মোকদ্দমা পেলাম কমলা, তুমি এবার থেকে বুঝি সত্যিই সার্থকনামা হ'লে।

কমলা খুন্তি নাড়া বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—সত্যি?

—হ্যাঁ গো। আমি যাচ্ছি একটু কন্‌সাল্‌টেশান্ করতে। ফিরলাম বলে'।

—বেশি দেরি কোরো না কিন্তু। আরেকটু পরেই কিন্তু ভদ্রলোকেরা এসে পড়বেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হইয়া গেছে, বাঁড়ুয্যের অনুবর্ত্তী হইয়া পথ চলিতে

লাগিলাম। বাঁড়ুয্যে বলিল,—মক্কেল বড়লোক আছে, বত্রিশ টাকার নীচে যাবেন না কিন্তু। ফি বেশি হ'লেই দুজনের লাভ।

বত্রিশ টাকার সাড়ে বারো পার্সেণ্ট্ হিসাব করিতে করিতে যে-গলিটায় আসিয়া ঢুকিলাম তাহাতে পা দিয়াই বুকটা আমার ভয়ে ছ্যাং করিয়া উঠিল। বলিলাম,—বাঁড়ুয্যে, এ গলি?

বাঁড়ুয্যে বিরক্ত হইয়া কহিল,—আজ্ঞে হঁ্যা। মক্কেলরা ত আর সবাই আপনাদের মত বড়লোক নয়, তারা মাটির ঘরেই থাকে পচা বস্তিতে। তাতে কি হয়েছে?

কিছু হয় নাই বটে; আমিও পচা গলিতে মাটির ঘরেই থাকি—তবুও এই গৃহবাসিনীদের সংস্পর্শে আসিতে মনটা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলাম না, বরং প্র্যাক্‌টিস জমাইবার পক্ষে এই দুর্ব্বলচরিত্রতা যে মোটেই সহায়তা করিবে না তাহা ভাবিয়াই মনকে শাসন করিলাম।

বাঁড়ুয্যে আমাকে একটা ঘরে নিয়া আসিল। ফিট্‌ফাট্ শয্যা পাতিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে, হাত তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া কহিল—আসুন উকিল বাবু, বসুন।

ধরণী, দ্বিধা হও, বলিয়া সামনের চেয়ারটায় বসিলাম। মেয়েটি বত্রিশটা টাকা (নোট নয়) গুণিয়া গুণিয়া শব্দ করিয়া আমার পায়ের কাছে মেঝের উপর রাখিল ও পায়েরই তলায় বসিয়া অশ্রু-ভারাতুর চোখে তাহার গল্প বলিতে লাগিল। গল্পটা যেমন অশ্লীল তেমনিই ন্থকারজনক; তবুও পেনাল্-কোডে এই সব অপরাধের শাস্তি বর্ণিত আছে বলিয়াই বাঁড়ুয্যেকে দিয়া কাগজ-কলম আনাইয়া গোটা বিবরণটা

লিখিয়া লইলাম—ঠিক কোন্ section-এ পড়ে বাসায় গিয়া বই মিলাইয়া দেখিতে হইবে। সেই কুৎসিত ইতিহাসটা শেষ করিয়া মেয়েটি দুইহাতে টাকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া আমার বুক-পকেটে ঢালিয়া দিল—আমি বিমর্ষমুখে একবার বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে তাকাইলাম।

বাঁড়ুয্যে কহিল,—না না, নেবেন বৈ কি, 'ক বল্, কমলি?

এই মেয়েটি আমারই স্ত্রীর নামাঙ্কিত মনে করিয়া নিদারুণ লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হইল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম, কহিলাম—আচ্ছা, তুমি কাল এঁকে কোর্টে এগারোটার সময় নিয়ে যেয়ো বাঁড়ুয্যে, আমি রাত্রে পিটিশান্ ড্রাফট করে' রাখব। চলি এখন।

চৌকাঠ ডিঙাইতেছি, সহসা পিছন হইতে মেয়েটি আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিল, কহিল—এক্ষুনি যাবে কি মাইরি?

বাঁড়ুয্যে নীচের ঠোঁটটা ঝুলাইয়া দিয়া কহিল—মক্কেলদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে' বত্রিশটাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, বেশ লোক যা হোক।

মেয়েটি আমাকে এক রকম জোর করিয়াই চেয়ারে বসাইয়া দিল। তারপর খাটের তলা হইতে একটা পানীয়পূর্ণ গ্লাশ লইয়া একেবারে আমার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া কহিল,—খেয়ে ফেল ত এটা। গরিবের ঘরে এলে' আতিথ্য না করলে কি ভাল দেখায়?

গ্লাশশুদ্ধ কমলিকে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিব বলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছি এমন সময় বুক-পকেটের মধ্য হইতে বত্রিশটা টাকা এক-সঙ্গে কথা কহিয়া নিষেধ করিল। সামান্য একগ্লাশ মদ বই ত নয়, কাবলিওয়ালার লম্বা পাগড়ি ও লম্বা লাঠির কথা মনে করিয়া গ্লাশটা মুখে তুলিলাম। মেয়েটি গ্লাশের তলায় হাত রাখিয়া আমার উন্মুক্ত

মুখের মধ্যে একসঙ্গে গ্লাশের সমস্ত মদটা ঢালিয়া দিল, দম লইয়া ঢোঁক গিলিবার পর্য্যন্ত সময় পাইলাম না। দগ্ধ ঠোঁটটা জামার হাতায় মুছিতে যাইতেছি কমলি মুখ নীচু করিয়া তাহার ঠোঁটের সাহায্য নিতে বলিল।

কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, কিছুই বুঝিলাম না; লিভারের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকও কামড় দিয়া উঠিয়াছিল কি না ঠাহর নাই, কিন্তু কমলিকে সহসা সহস্র কমলার চেয়ে সুন্দর মনে হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া, গ্লাশ বাটি ভাঙিয়া, মুখখারাপ করিয়া কেলেঙ্কারির লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসিলাম।

'ভূত দেখবি আয়' বলিয়া কমলি অন্যান্য কতগুলি মেয়ে ডাকিয়া আনিয়া ঠাকুর হাট জমাইয়া তুলিল। আমিও বাড়ি, ঘর, কমলা, নিমন্ত্রণ, অভ্যাগত-সমাগম সব ভুলিয়া ঢোল হইয়া রহিয়াছি। ইহারই মধ্যে এক সময় টের পাইলাম বাঁড়ুয্যে আমার বুক-পকেটে হাত ঢুকাইয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া নিতেছে, পকেটটা ধরিয়া টান দিতেই সবগুলি টাকা মেঝের উপর মাতৃহীন শিশুর মত কাঁদিয়া পড়িল। টাকার আর্ত্তনাদ শুনিয়া জ্ঞান হইল বুঝি, একটা গ্লাশ তুলিয়া লইয়া বাঁড়ুয্যের মাথায় চৌচির করিয়া দিলাম।

গ্লাশটা ভাঙিয়াই মনে পড়িল আমাকে এইবার পলাইতে হইবে। যে মুহূর্ত্ত কয়টির জন্য বাঁড়ুয্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রক্তপাত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারই এক ফাঁকে সমস্ত মেয়েগুলোকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বানের জলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁড়ুয্যে তাড়া করিল বটে, কিন্তু সত্যযুগের মানুষের মতই তাহাকে দীর্ঘ হইতে হইয়াছিল বলিয়া ফের দরজায় একটা নিষ্ঠুর গুঁতা খাইয়া তাহাকে

দ্বিতীয় ক্ষতস্থান চাপিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িতে হইল। গলি পার হইয়া একটা ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলাম—তীব্রবেগে ছুটিতে হইবে। কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠিয়াই ছিন্ন রিক্ত পকেটটার দিকে চাহিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম ; ড্রাইভার হুইল্ ঘুরাইতেছে এমন সময় তাহাকে বাধা দিয়া নামিয়া পড়িলাম—ড্রাইভারটা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করিয়া বসিল।

ভাবিলাম আমার উপর এই নির্লজ্জ ও নিষ্ফল প্রতিশোধ লইয়া পৃথিবীতে বাঁড়ুয্যের কী লাভ হইল ?

নর্দ্দমায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে বাড়িতে যখন ফিরিলাম রাত তখন দুইটা বাজিয়া গেছে। কমলা যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া গলায় দড়ি দেয় নাই সেই আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি সহসা সে চেঁচাইয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল। আজ কমলার চরম পরীক্ষার দিন, সে সত্যই পতিব্রতা ; মাতাল স্বামীকে সে বিছানায় শোয়াইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ভোর হইতে না হইতে ঘুম ভাঙিয়া গেল, ভীষণ ক্ষুধাবোধ হইতেছে। কমলাকে না জাগাইয়াই রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিলাম—থরে থরে কত যে রান্না হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, ঢাকনি তুলিয়া প্রায় দুই হাতেই মুখে খাদ্যদ্রব্য গুঁজিয়া দিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি কমলাও আসিয়া হাজির—মুখে ভোর-বেলাকার প্রসন্ন নির্ম্মল হাসি, যে তারাটি এখনো আকাশে বিরাজ করিতেছে সেই তারাটির মতই বেদনা-উজ্জ্বল।

কমলাও আমারই পাতে বসিয়া খাদ্যদ্রব্যের অংশ লইতে লাগিল,—কাল সারারাত তাহারও খাওয়া হয় নাই।

ইহার পর দুইদিন আর কোর্টে যাই নাই, তৃতীয় দিন দেখি আমার নামে এক শমন আসিয়া হাজির, বাঁড়ুয্যেকে মারিয়াছি বলিয়া আমাকে আজ এগারোটার সময় কোর্টে হাজির হইতে হইবে। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। সমস্ত আকাশটা যেন বর্তুলাকারে ঘুরিতে-ঘুরিতে বিন্দুবৎ লীন হইয়া গেল।

কমলা দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—কেন তুমিই ত তোমার উকিল! নিজে নিজের পক্ষ সমর্থন করবে? কিসের ভয়? আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরলে শাস্তি হয় নাকি?

হ্যাঁ, এতদিনে আদালতে দাঁড়াইয়া সওয়ালজবাব করিবার সুযোগ আসিল বুঝি! আমি ও-পাড়ায় গিয়াছিলাম, মদ খাইয়াছিলাম, মারামারি করিয়াছিলাম—সকলের চোখের সামনে দাঁড়াইয়া এই সব অভিযোগকে আমার খণ্ডিত করিতে হইবে। হা ভগবান্!

বীরেশ্বরকে মনে পড়িল। কলেজে তাহার টার্ম ছয়মাস আগে ফুরাইলেও তাহার সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। সে আমার হইয়া বিনা-পয়সায় লড়িবে হয় ত; সারা বটতলায় আর কাহাকেও বন্ধু বা আত্মীয় বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারিলাম না। বীরেশ্বরকে সব কথা কহিলে সে হাতের উপর হাত চাপড়াইয়া কহিল,—আলবৎ। কিছু হবে না তোমার। Right of private defence. তা ছাড়া তোমাকে

মিথ্যা প্ররোচনায় সেখানে নিয়ে গেছে, ওরাই মদ খাইয়েছে—উল্টে ওদেরই জেল হবে। চাই কি, কিছু খেসারতও পেয়ে যেতে পার।

কিঞ্চিৎ অভয় পাইলাম বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া খেসারতের সংখ্যা নির্ণয় করিতে বসিয়া গেলাম না। পর দিন শুধু ধুতি আর সার্ট পরিয়াই কোর্টে হাজির হইলাম, ধ্বজা আর দেখাইতে ইচ্ছা করিল না। বীরেশ্বর আগে হইতেই প্রস্তুত, একটা কাউন্টার-কেসের 'পিটিশান্'-ও তৈরি করিয়াছে দেখিলাম। দেখিলাম বাঁড়ুয্যে মাথায় এক প্রকাণ্ড ফেটি বাঁধিয়া আমারই 'তক্তপোষ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, উহার কাছ দিয়াও গেলাম না। ডাক পড়িলে কাঠগড়ায় গিয়া উঠিলাম, জামিন পাইলাম, আরেকটা তারিখ পড়িল। কাউন্টার কেসটাও বীরেশ্বর বীরের মত পেশ করিয়া আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

দেখি, পেছনে অনেক শুভানুধ্যায়ীর ভিড় লাগিয়াছে, রামেন্দ্রবাবুই তাহাদের নেতা। তিনি হাত ধরিয়া বলিলেন,—কেস্‌টা মিটমাট করে' ফেল নটবর, ক্রিমিন্যাল কোর্টের কাণ্ড ত আর জান না, ভদ্রলোকের ছেলে, কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

এই পার্টটুকুর রিহার্সাল দিতে রামেন্দ্রবাবুকে এত প্রম্পট্ শুনিতে হইল যে মোকদ্দমার পরিণাম বিচার করিয়া মুহূর্ত মধ্যে বীরেশ্বরের অভয়বাক্যে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলাম। সহসা ডেমোক্রেসির যুগ হইতে এক লাফে একেবারে ব্রাহ্মণ্যযুগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। তক্তপোষে যেখানে বাঁড়ুয্যে মৌরসি করিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল তাহারই সমীপবর্তী হইয়া কথায় প্রায় কান্না জড়াইয়া কহিলাম,—মাম্‌লাটা তুলে নাও বাঁড়ুয্যে!

বাঁড়ুয্যে কঠিন হইয়া কহিল—বত্রিশ দুগুণে আরো চৌষট্টি টাকা দাও।

তাই সই, পরদিন কমলার হাতের চুড়ি চারগাছি বাঁধা দিয়া চৌষট্টি টাকা যোগাড় করিয়া আনিয়া বাঁড়ুয্যের পদতলে ঠেকাইয়া রাখিলাম। রামেন্দ্র বাবুর মোকাবিলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনেই মামলা মিট্‌মাট হইয়া গেল।

ব্যাপার শুনিয়া বীরেশ্বর ছুটিয়া আসিল। বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিল—মামলা মিটিয়ে নিলে, নটবর?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—হ্যাঁ ভাই, এ ঝক্‌মারি পোষাবে না।

তেমনি বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠেই বীরেশ্বর কহিল—এই প্রথম একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলাম ভাই, তাও কর্‌তে পেলাম না?

চম্‌কাইয়া উঠিলাম,—বল কি? এই প্রথম?

চোখ নামাইয়া বীরেশ্বর কহিল,—হ্যাঁ ভাই। আব বল কেন?

তাহার হাত ধরিয়া কহিলাম,—কদ্দিন এখানে বসেছ?

বীরেশ্বর অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল,—প্রায় এক বছর।

বটতলা হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। বীরেশ্বরের জীবনের এমন একটা সুবর্ণ-সুযোগ নষ্ট করিয়া আসিয়াছি বলিয়া দুঃখ হয় বটে, কিন্তু আমার ঐ তক্তপোষটা গাছতলায় পড়িয়া মাঠে মারা গেল বলিয়াও

দুঃখ কম হয় না। কেননা আমাদের ঘরে একটি নবীন রঙিন অতিথির আবির্ভাব হইয়াছে—একটি তক্তপোষে তিনটি প্রাণীর অকুলান্ হইতেছে। ছেলেকে লইয়া কমলা মেঝেতে বিছানা করিয়া শুইলে সারা রাত্ত আমার চোখে আর ঘুম আসিতে চায় না। ইস্কুল মাষ্টারি করিয়া এমন উদ্বৃত্ত অর্থের সংস্থান হয় না যে একখানা প্রশস্ত খাট কিনি।

যাই হোক, তক্তপোষটা বাঁড়ুয্যের কপালেই ঠেকিয়া রহিল; তাই থাক্। ঐ তক্তপোষে চড়িয়াই যেন সে চিতায় যায়—বটতলা ত্যাগ করিবার সময় এই আশীর্ব্বাদই উহাকে করিয়া আসিয়াছি।

অসম্পূর্ণ

ক

কাহার একটা রচনায় পড়িয়াছিলাম (বোধ হয় হ্যাজ্‌লিট্‌-এর) মানুষ মাত্রেই কবি ;—যে-কৃষক চাষ করিতে করিতে নবতৃণোদ্গম লক্ষ্য করে ও যে জ্যোতির্ব্বিদ অন্তহীন আকাশে রহস্যান্ধকারের দুর্ভেদ্যতা অতিক্রম করিয়া নূতন তারার জন্ম দেখে—তাহাদের আনন্দ কবিরই আনন্দ। (চ্যাপম্যানের 'হোমার্‌' পড়িয়া কীট্‌স্‌-ও এমনি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল।) কসরৎ করিয়া কবিতা লিখিবার অভ্যাস না করিলেও আমি এক দিন কবি হইয়া উঠিলাম, যেদিন এই ধূলার জগৎকে আর কঠিন ও কদর্য্য মনে হইল না, প্রতি রুক্ষ নিরানন্দ দিনটি কলালক্ষ্মীর পদশায়ী শতদলের পাপড়ির মত সুকোমল ও সৌরভসিক্ত হইয়া উঠিল, —আমার অস্তিত্ব যেন অসীমবিস্তৃত,—আমার মন আকাশ-পারাবারের পার খুঁজিতে যেন দুই ব্যাকুল পাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে !

এই ভাবটা আমাকে কখন্‌ আক্রমণ করিল তাহা বুঝিতে তোমাদের

নিশ্চয়ই দেরি হইবে না, মানে—আমি যখন ভালবাসিলাম। (ভয় নাই, বিবাহ করিয়াই ভালবাসিলাম।) সে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি,—সেই একই হৃদয়াবেগ নিয়া বিধাতাও বোধ হয় রাত্রির অন্ধকারকে এমন সুন্দর করিয়াছেন,—বাসররাত্রে পার্শ্বশয়ানা নববধূটিকে একটি মূর্ত্তিমতী শুভ-সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি বলিয়া মনে হইল, স্নেহ-কে আমি এক মুহূর্ত্তেই এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, পৃথিবীতে নির্জ্জন বলিতে আমার কাছে আর কোন স্থান নাই,—স্নেহ-কে ছাড়িয়া আসিলেও আকাশের নীচেকার সমস্ত নিঃশব্দতা একটি লাবণ্য-ললিতা নারীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে কেবলই কথা কহিতে থাকে। Castiglione ঠিকই বলিয়াছেন, যে-বিধাতাকে আমরা কখনও দেখি নাই সেই বিধাতাকে আমরা নারীর মধ্যেই দেখিয়াছি।

শতকরা নব্বুই জন বাঙালি ছেলের মতই বি, এ পাশ করিয়া ল' লইয়াছিলাম কিন্তু এক বৎসর না চুকিতেই মা'র এমন অসুখ হইয়া পড়িল যে, রান্নাঘরের জন্য একটি পাচিকা ও মা'র রোগশয্যাসমীপে একটি নার্সের দরকার হইল। অতএব আপত্তি আর টিঁকিল না, আমার চির-কৌমার্য্যের গৌরবময় উত্তুঙ্গ পর্ব্বতটা নিমেষের মধ্যে গুঁড়া হইয়া গেল; একেবারে বাস্তবতার সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলাম। সীমাবদ্ধ কুঠুরীর জানালা দিয়া আকাশের যে স্বল্পপরিমিত অংশটুকু একটা বৃহত্তর প্রকাশের ইঙ্গিত করে, তাহারই অনুপাতে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বড় করিয়াছিলাম, কিন্তু স্নেহ আসিয়া সেই জানালা বন্ধ করিয়া দিল। সেই ছোট্ট ঘরটিতে স্নেহ একটি স্নেহপ্রদীপ জ্বালিল বটে, কিন্তু আকাশের তারা আর দেখা গেল না।

সেটা আমার পক্ষে কম দুঃখের কথা নহে, কিন্তু শেলির স্বপ্ন ছাড়িয়া যে ফোর্ডের স্বপ্ন দেখিব, মস্তিষ্কে তেমন ভাবাবেগও ছিল না হয় ত। তাই বিনা মূল্যে যাহা কুড়াইয়া পাইয়াছি তাহা লইয়াই জীবনের হাটে আমাকে সওদা করিতে হইবে; কিন্তু বৎসর ফুরাইতে না ফুরাইতেই সেই পাথেয়ও ফুরাইয়া গেল। অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়াই আকাশ আজিও মর্ত্যবাসীর কাছে একটি সুদূর ইঙ্গিতের মত অনির্ব্বচনীয় সুন্দর রহিয়াছে, এবং এই একই কারণের বিপরীত অর্থে স্নেহ আমার কাছে নিরাবরণ ও নিষ্প্রভ হইয়া গেছে।

কথাটাকে খুব ঘনীভূত করিয়া বলিলাম বটে, কিন্তু ইহার চেয়ে ব্যক্ততর করিলেও কথাটা এমনিই সুবোধ্য থাকিত। বরং অনেক সময় উদাহরণ দিয়া ফেনাইয়া বলিলেই কথার সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ অর্থটার উপলব্ধি হয় না। প্রথম যখন স্নেহকে পাইয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, —যদি পারিতাম ত এই অনন্তকালের ঘড়িটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া এই চঞ্চল আনন্দক্ষণটিকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিতাম; এখন মনে হইতেছে যেন একটা আতসবাজির মত এই বৎসরটা একটা রঙের আর্ত্তনাদ করিয়া শূন্যে লীন হইয়া গেল!

ব্যাপারটা আরো সঙিন হইয়া উঠিল যখন শুনিলাম ল'র পাশের লিষ্টে আমার নামের পাশে নীল পেনসিলে একটি চিকে দেওয়া হইয়াছে। ছ'মাস পরে ফের পরীক্ষা দিয়াও সেই চিকে-টা সরাইতে পারিলাম না, যীশু খৃষ্টের গলায় ক্রুশের বোঝা এমনিই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিলেও অপমান-জনক হয় নাই। সব চেয়ে খারাপ লাগিল যখন শুনিতে পাইলাম আমাদের সংসারের আনাচে-কানাচে এইরূপ কানঘুষা চলিতেছে যে

স্নেহ-র স্নেহাধিক্যের জন্যই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে। রাসবিহারী ঘোষকে মনে মনে নমস্কার করিয়া সরিয়া আসিলাম; স্নেহ জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি করবে?

একটু রুক্ষ হইয়াই বলিলাম—তোমাকে বিয়ে না কর্‌লে এ-প্রশ্ন আমার নিজেকেও কর্‌তে হ'ত না, কিন্তু যে খোলা দরজা দিয়ে তুমি এলে তোমারই পদানুসরণ করে' নৈরাশ্য এল, দরিদ্রতা এল—

স্নেহও কঠিন হইতে জানে। কহিল—আমাকে বর্জ্জন করবার মত সৎসাহস যদি তোমার থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি দারিদ্র্যমোচন করবার প্রতিজ্ঞার অধিকারী হও, যাও না আমাকে ছেড়ে। আমি হ'লে বাড়িতে বসে' বসে' সিগারেট পুড়িয়ে আপ্‌সোস্ কর্‌তাম না।

কৌতূহলী হইয়া কহিলাম—কি কর্‌তে?

—ভাগ্য তৈরি করতে বেরিয়ে পড়তাম। যে দুঃসাহসে ভর করে' মানুষ নিজের দেহ থেকে অভিজ্ঞতা পেয়ে যন্ত্র গড়েছে সেই সাহসে আমার মন রসিয়ে নিতাম, পরিশ্রমের স্বেদের মধ্যেই যে আনন্দের সুখ আছে তার তুলনা কোথায়?

স্ত্রীর বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বাড়ির বাহির হইলাম বটে, কিন্তু একটা সামান্য ইস্কুল মাষ্টারি ছাড়া আর কিছুই জুটাইতে পারিলাম না। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে কবে ভাবিয়াছিলাম যে আমাকে তরবারির পরিবর্ত্তে সামান্য একটা বাঁশের কঞ্চি লইয়া বসিতে হইবে, শেলির চোখ দিয়া যে এমিলিয়া ভিভিয়ানিকে দেখিয়াছিলাম সে আজ শুধু একটা ব্যাকরণের সূত্র হইয়া থাকিবে; বন্দী প্রমিথিয়ুসের দুঃখের সঙ্গে নিজের অকিঞ্চিৎকর দুঃখের তুলনা পর্য্যন্ত চলিবে না?

তাই সই ; এত সহজে দমিবার পাত্র আমি নই, মাষ্টারি করিতে করিতেই এম-এ-টা পাশ করিয়া লইব ; (এততেও আমার পাশ করিবার মোহ কাটিল না,) চাই কি, তার পরে একটা ভাল চাকুরিও মিলিতে পারে। তাই মনে বল সঞ্চয় করিয়া কাজে নামিয়া গেলাম, স্নেহ-ও সংসারের সর্বত্র তাহার অন্তরমধু পরিবেশণ করিতে লাগিল। দাদা আজ প্রায় পনেরো বৎসর বেকার ভাবে বসিয়া বসিয়া ভাত গিলিতেছেন, বৌদিদি সন্তানের জনতার মধ্যে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া আছেন. ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথাটা ঘুরাইয়া লইলে স্নেহ-ই যেন "the very pulse of the mechine।" কিন্তু মনে হয়, তারপর ? এই একঘেয়েমির শ্রান্তি হইতে কোথাও কোনও দিন মুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্নেহ তাহার চোখে নিরানন্দতার ভবিষ্যতের আশঙ্কাসূচক একটি সঙ্কেত লইয়া কাছে আসে। বলি—আমাদের সমাজ থেকে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

পাছে শুনিতে খারাপ হয় এই ভয়ে স্নেহ প্রথমে কথাটার প্রতিবাদ করে এবং ঐ কথার স্বপক্ষে যত ভাবপ্রবণ যুক্তি আছে সব খাড়া করিতে থাকে, কিন্তু আমার বিদ্রূপপূর্ণ প্রচণ্ড তর্কের ঝড়ে সেই সব খুঁটিগুলি ভাঙিয়া পড়ে। বলি—অনেকগুলি আধ-মরা প্রাণ থেকে একটা তেজী সবল প্রাণ ঢের বেশি কাম্য,—এবং এতগুলি ব্যর্থ প্রাণ টিঁকিয়ে রাখবার জন্ত আমাকে আর তোমাকে তিলে তিলে আত্মবলি দিতে হবে আমি এই যুক্তির রসগ্রাহী নই। রুষিয়ায় হ'লে—

স্নেহ হাসিয়া বলে—ভাগ্যিস্ এটা বাঙলা দেশ,—যেখানে বুড়ো বাপ-মা'র পদসেবা করে' বৈকুণ্ঠলাভ করবার বিধি আছে, অসমর্থ ও

২০

অসুস্থ পরিজনের সাহায্য করে' আত্ম-তৃপ্তি পাবার অধিকার আছে। এই দেশই আমার ভাল, এর সংস্কার, এর প্রথা। আমাকে ঠাট্টা করে' লাভ নেই, তবে তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে, তুমি যেন আস্‌চে জন্মে রুষিয়াতেই গিয়ে জন্ম গ্রহণ কোরো, আমি এই বাঙলা দেশেরই পথ চিনে আসব 'খন।

বলিয়া বসিলাম—কিন্তু রুষিয়ার ছেলের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের বিয়ে হবে কি করে'? আস্‌চে জন্মে তোমাদের বাঙলা দেশের আইন কানুন বদ্‌লে যাবে না কি?

স্নেহ চুপ করিয়া রহিল। কেন জানি না মনে হইল স্নেহ আমাকে বিবাহ করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হয় নাই,—এই ভাবটা আমার মনে উঠিতে পারে এই সন্দেহ করিয়াই তাড়াতাড়ি কহিল—কিন্তু, আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি না, আমি ইহকালে এত ভাল ভাবে আমার কাজ করে' যাব, এত নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে যে মৃত্যুর পরে আমার নির্ব্বাণ পেতে একটুও দেরি হবে না।

একটা আগন্তুক বিড়ালের আবির্ভাবে রান্নাঘরে কি-একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, নীচে হইতে মা চেঁচাইয়া উঠিয়া স্নেহকে বাক্যবাণে জর্জ্জর করিতেছেন, (একটু কল্পনা করিলেই তোমরা তা বুঝিতে পারিবে।) স্নেহ তাড়াতাড়ি আমার জামা-সেলাই বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। উহার চোখে ইহার আগে এমন নিরুৎসাহ অসহায় চাহনি দেখি নাই। উহাকে বাঁচিতে হইবে, কিসের জন্য বাঁচিতে হইবে? সব চেয়ে বেদনার কথা, উহার মধ্যে একটি তপস্যানিরতা বৈরাগিনী আছে, খাঁচার পাখীর মত খাঁচায় থাকিতে থাকিতে দুই পাখা এখনও পঙ্গু করিতে পারে নাই।

পঙ্গুতাপ্রাপ্ত হইলেই স্নেহ বাঁচিয়া যাইত,—তবে ভরসার কথা স্নেহ সেই দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। আমিই ত উহার চিকিৎসক।

খ

আমার বিবাহের সময়-ই গিরীনের সঙ্গে আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য হইয়াছিল,—গিরীন স্নেহ-র দূর সম্পর্কের কি-রকম মামা হয় বোধ হয়। সম্প্রতি সে ষ্টেট্-স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত যাইতেছে এবং সেই বিদেশ-যাত্রারই প্রাক্কালে বিনা-খবরে আমাদের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। আমি ও স্নেহ উভয়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

সমস্ত দিন কি হাসি ও খুসির মধ্য দিয়া কাটিল তাহার সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আমি আর স্নেহ দুই জনেই মানসিক স্বাস্থ্য পাইয়া সুন্দর হইয়া উঠিয়াছি—গুমটের পর যেন একটু ভিজা হাওয়া আসিল। ঘর বেশি ছিল না বলিয়া গিরীনকে আমাদেরই ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দাতে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল,—আমাদের ঘরের দরজা ও জান্‌লাগুলি খোলাই রহিল অবশ্য। স্নেহ যে কখন্ শুইবে তাহার হিসাব নাই, সারাদিন ছেলে ঠেঙাইয়া আসিয়া এখন ঘুমে আমার চোখ ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাহারই এক ফাঁকে দেখিলাম স্নেহ মেঝেতে মাদুর পাতিতেছে। মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙিতেই দেখি স্নেহ ঘরে নাই, বারান্দায় গিয়া গিরীনের সঙ্গে স্বাভাবিক অনুচ্চ কণ্ঠে গল্প করিতেছে। সমস্ত দৃশ্যটি মনে-মনে কল্পনা করিয়া আমার কী যে ভাল লাগিল তাহা

বলিবার নয়। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা নিয়া গল্প করিয়া-করিয়া রাত্রি কাটাইতে আমি স্নেহকে ইহার আগে কোনও দিন অনুমতি দিই নাই বলিয়া আমার অনুতাপ হইতেছিল। উহারা সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিতেছে :

স্নেহ

তুমি এখন ঘুমোবার চেষ্টা কর, কাল ভোর হ'তে না হ'তেই তোমার ট্রেন,—রাত অনেক হ'য়ে গেল।

গিরীন

তুমি অত্যন্ত ছোট পৃথিবীতে বাস কর, দেখছি। তোমাদের এখানে অন্ধকার হ'লেও পৃথিবীর অন্য এক পিঠে এখন খাসা দিনের আলো, টাট্‌কা রোদ। তোমরা বুঝি রাতের তারা দেখলেই দিনের সূর্য্যকে ভুলে যাও, একবার বর্ষা নাম্‌লেই আর গ্রীষ্মকে মনে রাখ না,—তোমাদের স্মৃতি এত ক্ষীণ, ভালবাসা এত স্বল্পায়ু! আচ্ছা, তুমি বুঝি পড়াশুনো আজকাল ছেড়ে দিয়েছ?

স্নেহ

হ্যাঁ, পড়াশুনো! সারাদিন খেটে-খেটে ঘুমোবার সময় পাই না, আবার পড়ব! ইস্কুলে যখন পড়তাম, তখন মনে আছে ঘরে আলো জেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছি, আলো নিবিয়ে দিয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে কবিতা পড়া আমার তখনও শেষ হয় নি।

গিরীন

রাতে কবিতা পড়তে? তুমি বাঙালি-বুদ্ধির বিশেষত্ব বজায় রেখেছ

দেখছি,—আমি কিন্তু রাত জেগে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ি, তার মানে এই কোরো না যে মধ্যাকাশবিহারী তারা দেখে আমার কারো চোখ মনে পড়ে। আচ্ছা, বিলেত গেলে তোমাকে নতুন নতুন বই পাঠাব 'খন, সময় করে' একটু-একটু পোড়ো,—ঐ বইগুলিকেই তোমার অচলায়তনের বাতায়ন কোরো। শুনেছ আজকাল বাঙলাদেশে নতুন সাহিত্য নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে—

স্নেহ

শুনেছি একটু-একটু; ভাল করে' পড়িনি। তবে শুন্‌ছি ঐ সাহিত্য সাময়িক উত্তেজনার সাহিত্য, ও টিঁক্‌বে না।

গিরীন

(হাসিয়া) তুমি যে ভারি মুরুব্বির মত কথা বল্‌ছ, যেন কোনো সস্তা সমালোচকের ধার-করা কথা। টেঁকা না টেঁকাটা সাহিত্য-বিচারের একটা টেক্‌নিকাল কথা,—ক্লাসিকাল্‌ হওয়াই সাহিত্যে অমর হওয়া নয়। ধর পোপ, তুমি বল্‌বে হয় ত উনি বেঁচে নেই, ইতিহাসের পাতায় নাম থাক্‌লে কি হ'বে—কিন্তু আমি বল্‌ব উনি বেঁচে আছেন, ওঁর থেকে আমি রসগ্রহণ করেছি, সেই সংযম, সেই দৃঢ়তা, সেই স্পষ্টতা—

স্নেহ

সস্তা সমালোচক বল্‌ছ কি ?—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। তা ছাড়া তুমি কথাটার মানেই বোঝনি।

গিরীন

জানি, তুমি বল্‌বে সাময়িক সমস্যা নিয়ে যে সাহিত্য তার আয়ুষ্কাল

সেই সমস্যার স্থায়িত্ব দিয়েই নির্ণীত হবে—স্থানীয় সমস্যা নিয়েও যে উঁচু-দরের সাহিত্য হ'তে পারে গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার মত কিছু তাই। কিন্তু সমস্যা আছে বলে'ই গর্কি বা ওয়েল্‌সের সাহিত্য বাতিল হ'য়ে যাবে এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বর্ত্তমানের কোন মানুষের মুখেই মানায় না! দেখতে হবে সমস্যার জঞ্জাল ভেদ করে' সেটা সত্যিকারের সাহিত্যরচনা হয়েছে কি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শবাদের সমস্যা আছে বলেই 'গোরা' সাহিত্য-রচনা হিসাবে অসার্থক এ কথা আমি বলি নে। ধর 'যোগাযোগ'—তার যে সমস্যা সে বিশেষ করে' বিংশশতাব্দীর,—একটি ক্ষীণা সুকুমার মেয়ে কুমু এক স্থূল মাংসপিণ্ড মধুসূদনকে ভালবাসতে বাধ্য হচ্ছে—হয় ত আমরা দেখব এক যুগ পরে সেই আধ্যাত্মিকগুণসম্পন্না কুমু নিজে যেচে স্বয়ম্বরা হচ্ছে, নিজে সানন্দে সন্তান ধারণ করছে—তখন কোথায় থাকবে যোগাযোগের সমস্যা? সেই জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ সে-যুগে back-number হ'য়ে পড়বেন না? তুমি বলবে, না, কেন না সেই সঙ্কীর্ণ বিষয়বস্তু ছাড়িয়েও যোগাযোগের হয় ত একটা চিরন্তন আবেদন আছে। 'বিসর্জ্জন' নাটকের পশুবলি সমস্যা ত আমাদের যুগেই লোপ পেতে বসেছে, তার জন্য কি ঐ নাটকের মৃত্যু ঘটবে? সমস্যা ছাড়া ওতে কি আর কোনো পদার্থ নেই? Similarly, গর্কি *On the Raft* ও *Mother*এর লেখক হলেও কিংবা *Wil iam Clissold* লিখেও ওয়েল্‌স তাদের মধ্যেই এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যা হয় ত কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে' চলবে। অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ এই ভবিষ্যৎ, মেরিডিথ এককালে জর্জ্জ ইলিয়টকে স্বল্পায়ু সাহিত্যিক বলে' ঠাট্টা করেছিলেন, কিন্তু খবরের কাগজে দেখতে পাই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মেরিডিথের শতবার্ষিকীর দিনে

লোকই হয় নি। *Return of the Native* বেরুলে *Athenaeum* কাগজ হার্ডিকে কি গালটাই দিয়েছিল, কিন্তু কে জানে হার্ডি সম্বন্ধে সেই অবিবেচনা-প্রসূত মতটাই ভবিষ্যতে স্থায়ী হবে কি না।

স্নেহ

পড়ি না পড়ি না ক'রেও সে দিন একটা বই কিনেছিলাম খবরের কাগজে সমালোচনা পড়ে',—বইটার নাম *All Quiet on the Western Front*, তুমি পড়েছ? ধর সেই বইটা,—যুদ্ধ নিয়ে লেখা, তার নিষ্ঠুর বীভৎসতা, গ্লানি আর উৎপীড়ন। টিঁকবে ও? এর আগে যুদ্ধ নিয়ে কাউকে কোন উপন্যাস লিখতে দেখেছ, এমন শ্রান্তিকর বর্ণনা পড়েছ কোথাও?

গির্বাণ

আগে যুদ্ধ নিয়ে সবিস্তারে এমন জোরালো ও অভিনব উপন্যাস হয়নি বলে'ই যে এ উপন্যাস টিঁকবে না এ যুক্তি লজিক্ দিয়ে সাব্যস্ত হবার নয়। তোমার লীগ অব নেশন্‌স্ ম্যালেরিয়া তাড়াতে পারলেও যুদ্ধ তাড়াতে পারবে না। মিলেনিয়াম্ ও ডিস্‌আর্মমেণ্ট—দুইই স্বপ্ন। অতএব মজুর বা কুলির জীবনের সমস্যা সত্ত্বেও কোনো উপন্যাস যদি সত্যিকারের রসসমৃদ্ধি লাভ করে, কে তাকে মারবে শুনি? একমাত্র সে, যে সমস্ত না পড়ে'ই তাড়াতাড়ি বিচার করতে বসবে।

স্নেহ

(বাধা দিয়া) কিন্তু গল্‌সোয়ার্দির *Forsyte Saga*,—অদ্ভুত কীর্ত্তি! ভিক্টোরিয় যুগ অতিক্রম করে' এসে এই বিংশশতাব্দীতে পা দিয়েও একটি

অধিবাস

বারো যুদ্ধের নিদারুণ অসহ্য বর্ণনা করেন নি,—খালি যুদ্ধাবসানের পর তার নিরানন্দতা বা বৈফল্যের ইঙ্গিত করেছেন—তাতেই তাঁর সৃষ্টি চিরন্তন ঐশ্বর্য্য-লাভের অধিকারী হয়েছে।

গিরীন

যুগান্তরে *Forstye Saga*র সে-মহিমারও হ্রাস হ'তে পারে, স্নেহ। জনষ্টনের শেক্‌স্‌পীয়ার ও সুইন্‌বার্ণের শেক্‌স্‌পীয়ার কি একই ব্যক্তি? সেই শেক্‌স্‌পীয়ার-ই কি ফের বার্ণাড শ'র হাতে পড়ে' রং বদ্‌লান নি? ভিক্টোরিয় যুগে ব্রাউনিঙের কি খ্যাতি ছিল?—বায়রণের খ্যাতি কি সমস্ত ইউরোপ গ্রাস করে' ছিল না? এলিজাবেথান্ যুগের হ্যাম্‌লেট্‌-নাটকে হয়ত ভূতপ্রেত বা 'নাটকের মধ্যে নাটকের' সার্থকতা ছিল, কিন্তু এ যুগে তার মূল্য কোথায়? সারা ইংলণ্ড ঘুরে তুমি একটি ওফিলিয়ার দেখা পাবে? কিন্তু আমাদের এই বাঙলা দেশে সমস্ত মেয়েই কি এক অর্থে ওফিলিয়া নয়?—অভিভাবকের আদেশ মাথায় করে' কি সবাই হেঁট-হ'য়ে বলে না, 'I shall obey my Lord?' কোনো মেয়ে কি কোনো পুরুষকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, সহানুভূতি করে?—কিন্তু আর না, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই অন্ধকারটুকু থাক্‌তে-থাক্‌তেই আমি বেরিয়ে পড়ব।

স্নেহ

(ব্যস্ত হইয়া) বল কি, তোমার ট্রেন ত ভোরে ছাড়বে—এখনই যাবে কি? (মৃদু হাসিয়া) সাহিত্যালোচনা কর্‌তে-কর্‌তে তুমি দেখছি পাচ্ছি লোচন হারিয়েছ।

অধিবাস

গিরীন

কিন্তু ঠিক যাবার মুহূর্ত্তের কয়েকটি মুহূর্ত্ত আগেই যাওয়া ভাল, কেন না বিদায়ব্যথা বলে' কোনো জিনিসের বালাই থাকে না। তোমার স্বামীকে জাগিয়ে লাভ নেই, ওঁকে ঘুমুতে দাও,—আমিই ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছি, হঁ্যা, এতেই হবে। বিলেত থেকে চিঠি লিখলে সময় করে' জবাব দিয়ো কিন্তু। অনেক রাত বকা হয়েছে। ভোরের আলো এসে না পড়তে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো, বুঝলে? এই সময় ঐ নির্জ্জন মাঠের পথটা কি চমৎকার লাগে বল ত!

স্নেহ গিরীনকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া মশারি তুলিয়া আমারই বিছানায় আসিয়া শুইল। স্নেহ যদি একটা আলো জালিয়া টেবিলের কাছে বসিয়া কিছু পড়িত, তাহা হইলে ছবিটা এমন অসম্পূর্ণ থাকিত না। কিন্তু একটু ঘুমাইয়া না লইলে কাল আবার সংসারের কাজ করিবে কি করিয়া? পূবের দিকে বারান্দা, সেই দিকের দরজাটা খোলাই আছে, মনে হয় স্নেহের চোখে সত্যিই ঘুম আসিতেছে না,—ঐ দরজার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া ভোরের আলোর প্রতীক্ষা করিতেছে!

গ

স্নেহ-র ডায়রি হইতে

"এই সত্যটাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উপলব্ধি করিতে গিয়া আনন্দে ও

বিস্ময়ে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি, তোমার এই শুভ আশীর্ব্বাদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়ো।

আমার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে,—আমি মাতার গৌরবময় মর্য্যাদা লাভ করিতে চলিয়াছি, এত দিনে আমার নিঃসঙ্গতা বুঝি দূর করিলে, ঈশ্বর! আমার ও আমার স্বামীর দৈনন্দিন জীবনে এইবার হইতে একটি সুমধুর সংযম আসিবে, একটি প্রসন্ন নির্ম্মলতা,—আমরা পরস্পরকে নূতন আলোতে চিনিব,—সেই পরিচয়ই আমাদের সত্য পরিচয় হোক্!

ভাবিতে কি অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়বোধ হইতেছে, আমার জঠরে যে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটুকু নব প্রাণলাভের আশায় কম্পিত হইতেছে—সে-ই এক দিন আমারই মত এই আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আকাশকে আলিঙ্গন করিতে চাহিবে, শুক্ল রাতে একলা বসিয়া কবিতা পড়িবে, বোধহয় বা ভালবাসিবে! আমার এই আকারহীন অস্তিত্বহীন শিশু কোথা হইতে এই বেগময় চঞ্চল প্রাণ হইয়া আসিয়াছে। ল্যাম্ব ও মেটারলিঙ্কের Dream-Children-এরও সুদূরবর্ত্তী রাজ্য [illegible]ত এই অতিথি আমার দেহের অন্ধকারে আসিয়া বাসা বাঁধিল, বিধাতা, তোমাকে কি করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব? তুমি আমাকে মুক্তি দিলে!

সংসারের সিংহাসনে এইবার আমার প্রতিষ্ঠা হইবে, এইবার আমি আমার অবিচল সতীত্বের অহঙ্কার করিতে পারিতেছি। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া যেমন তারার বুদ্বুদ ফোটে, মাটি হইতে তৃণাঙ্কুর,—তেমনি আমার এই মৃন্ময় দেহ হইতে একটি বলিষ্ঠ সন্তানের আবির্ভাব হইবে,—আমার সীমন্তের সিন্দুর আরও গর্ব্বোজ্জ্বল হইয়া উঠুক! স্বামীকে এখনো এই

শুভসংবাদটা দেওয়া হয় নাই, মধ্যরাত্রে উঠিয়া তাঁহার কানে কানে এই কথাটি কহিব—আজ রাত্রে সত্যিই ঘুমাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

কি একটা কাজের তাড়ায় লেখাটা সাঙ্গ না করিয়াই স্নেহকে উঠিয় পড়িতে হইয়াছিল, খাতাটা তাড়াতাড়িতে বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে সকাল বেলার টিউশানি সমাধা করিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা খোলা খাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার লিখিতাংশ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। খবরটা শুনিয়া দস্তুরমত ঘাবড়াইয়া গেলাম,—ইহাকে লইয়া স্নেহ নাচিয়া উঠিয়াছে—উহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে না কি? আয়নাতে চাহিয়া দেখিলাম আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে,—একটা নূতন প্রাণীর শুভপদার্পণের সম্মানে মাহিনা আমার এক পয়সাও বাড়িবে না,—এত বেশি দেরি হইয়া না পড়িলে স্নেহকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। বিবাহ ত ইহার জন্যই করিতে চাহি নাই।

স্নেহ ঘরে ঢুকিল। ঠাট্টা করিয়া কহিলাম—খুব যে সাহিত্যিক হ'য়ে উঠেছ—

স্নেহ সব বুঝিল, কিন্তু একটুও হাসিল না। মধ্যরাত্রে কানে কানে শুভসংবাদটা বলিতে পারিল না বলিয়াই হয় ত রাগ করিয়া খাতার পাতাটা টান্ দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ এক চোখে স্নেহ-র দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য চোখে আমাকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

অধিবাস

ঘ

মাস দশেক পরে কলিকাতায় এক ডাক্তার-বন্ধুকে এই চিঠি লিখিতেছি :

২৯শে আশ্বিন

প্রিয়বরেষু,

আমাদের বিপদের কথা শুনিয়াছ বোধ হয়,—আমার স্ত্রী অকালে প্রসব করিতে গিয়া কয়েক দিন হইল মারা গিয়াছেন, ছেলেটাও ভূমিষ্ঠ হইয়া একবার পৃথিবীর নির্মমতার স্বাদ পাইয়াই চোখ বুজিয়াছে। ভারি নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, কিন্তু এই ভাবে একা থাকিবার নিদারুণ উপহাস আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি আবার বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। তোমাদের রাস্তার উনচল্লিশ নম্বর বাড়িতে যে ভদ্রলোকটি আছেন তাঁহারই শ্যালিকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছে। মেয়েটি শুনিয়াছি ডায়সেশান স্কুলে পড়ে, গান বাজনাও কিঞ্চিৎ শিখিয়াছে, (আমাদের সংসারে ইহার চল্ নাই, তুমি তাই ইহাতে তাহার পারদর্শিতা দেখিয়া ঝুঁকিয়ো না।) কিন্তু চেহারাটি পছন্দ-সই কি না সেই বিষয়ে মত স্থির করিয়ো। মেয়ে মনোনীত হইলে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন ঠিক করিয়ো,—তোমার উপরই সব

ভার দিলাম। আমার পুনরায় বিবাহ করা সম্বন্ধে as a doctor তোমার যে সম্পূর্ণ সায় আছে ইহা আমি আন্দাজ করিয়া লইতে পারি। সব খোঁজ খবর লইয়া শীঘ্রই আমাকে চিঠি লিখিবে, আমি চিঠির আশা করিয়া রহিলাম। বিবাহ না করিয়া তুমি আশা করি ভালই আছ। কিন্তু একবার যাহারা আফিং ধরিয়াছে তাহাদের পক্ষে তাহা ছাড়া অসম্ভব। তোমার কি মনে হয়? ইতি।

হোমশিখা

ট্র্যাণ্ড্ রোড-এর পারে প্রকাণ্ড আফিস্। প্রথম দিন অমূল্যই সঙ্গে ক'রে' নিয়ে গিয়েছিলো :

এই যে, মিষ্টার ভাদুড়ি!

ভাদুড়ির ভুঁড়ির মাপে বাজারে বেল্ট নেই ; গ্যালিস্টা কাঁধ থেকে নামিয়ে খালি-শার্টে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি-সব কাগজপত্র ঘাঁটছেন ; ডাক শুনে মুখ তুলে বললেন : হ্যালো, তোমার কার্বন-পেপার্ হ'য়ে গেছে—

হ'য়ে গেছে? অমূল্য লাফিয়ে উঠলো : কিন্তু টেম্প্?

সেটা সম্বন্ধে সাহেব এখনো কিছু বলে নি। ক'রে' দেব, কিছু ভেবো না। ভীষণ ব্যস্ত, অ-ফুলি! চিঠি কাল পর্শুই পেয়ে যাবে 'খন। O. K.

ভাদুড়ি সরে পড়ছিলেন, অমূল্য বাধা দিলো :

আপনার কাছে আরো একটু কাজ ছিলো। দু' মিনিট।

দু' মিনিটে বিলিতি ডাক দু শো মাইল এগিয়ে আসছে। বল!

এ-আফিসে একটি লোক চেয়েছিলেন আপনি—

ও, হ্যাঁ। লোক চাই বটে। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে সপ্রতিভ সৌজন্যে বললেন,—আপনি? তা বেশ। মাইনে গোটা পঞ্চাশ টাকা, খাটুনিও বেশি নয়। দু' কলম ইংরিজি লিখতে পারলেই হ'ল। খালি সিকোয়েন্স অফ্ টেন্স্ সম্বন্ধে একটু হুঁসিয়ার।

অমূল্য হেসে বললে—বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলো মশাই, আই-এতে তিনটে লেটার পেয়েছে। অকালে বাপ মারা যাওয়াতেই না এই দুর্দ্দশা!

এ-কথাটা অমূল্য না বললেও পারতো। ভাদুড়ি ক্ষেপে উঠলেন : রেখে দিন্ মশাই বি-এল্-এ রে। ঢের দেখেছি। পরেশ মুখুয্যেকে চেন ত' হে। সেই তোমাদের কদমতলারই ত' লোক। এই আফিসে দরখাস্ত করলো : I am a M. A. আর বলো না।

হেসে অমূল্য বললে,—পরেশ মুখুয্যেকে চিনি না? হাওড়ায় মল্লিক-ফটকের কাছে সে এখন গাঁজার দোকান খুলেছে। সে আবার এম্-এ হ'ল কবে?

আর বোল না—যত সব অথা আর অজবুক নিয়ে কাণ্ড। যাক্, ওঁকে দেখে ত' খুবই স্মার্ট বলে' মনে হচ্ছে—হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই। কাল আসবেন, ঠিক বারোটার সময়। তখন মিনিট পাঁচেক হয় ত' ফাঁকা থাকবো। আসবেন। ভুলবেন না।

এ-ও আবার মানুষে ভোলে!—এম্‌নি একটা নির্লজ্জ দারিদ্র্য চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো।

আসবেন কিন্তু।

ভাদুড়ি আবার মনে করিয়ে দেয়।

কয়েক পা এগিয়ে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌লাম,—লোকটি বেশ।

নিশ্চয়। ওর মেয়ের সঙ্গে যে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। তারিখটা পিছিয়ে রেখে ওকে দিয়ে কতগুলো কাজ বাগিয়ে নিচ্ছি।

কিন্তু তারিখটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলেই হয় ত' তোমার জোর আরো বেশি খাটতো।

পাগল! ওর মেয়েকে বিয়ে করবে কে? একটি স্কন্ধহীন হাঁড়ি। আমাকে যদি চটায় তা হ'লে খাতিরো চটবে।

লাভের মধ্যে আমারই চাকরিটাই ফস্‌কাবে তা হ'লে।

তোমার চাকরিটার জন্যেই ত' এ চক্রান্ত। নিশ্চিন্ত থাক'—স্রেফ হ'য়ে গেছে ওটা। মাকে গিয়ে বল সুখবরটা; বলো, আস্‌চে মাসে মাইনে পেলে আমাকে যেন নেমন্তন্ন করেন। মোচার চপ রাঁধতে বলো, বুঝলে?

সুখাবেশে গলার স্বরটা ভারি হ'য়ে উঠলো: তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো অমূল্য।

অমূল্য পৈতা রাখে, মঙ্গলবারে দাড়ি কামায় না, এবং হোটেলে অন্ন-টাও খাবার আগেও পঞ্চ দেবতাকে সবিনয়ে পাঁচটি ফোঁটা জল নিবেদন করে! সে বল্‌লে,—কৃতজ্ঞতাটা আরো ওপরে পৌঁছে দাও।

অধিবাস

ডালহৌসি স্কোয়ারের ধারে এসে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হ'ল। ও ধর্‌ল শিয়ালদার ট্রাম, আমি যাব ভবানীপুর। ট্রাম থেকে মুখ বাড়িয়ে ব্যস্ত হ'য়ে অমূল্য বললে,—কাল যেয়ো কিন্তু ঠিক, বারোটার সময়। ভুলো না যেন।

জপমন্ত্রের মতো মনে মনে আওড়াতে লাগলাম : ভুলি না যেন, ভুলি না যেন—

অমূল্যর সাম্‌নে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠতে লজ্জা কর্‌ছিলো বলেই ওকে আগে যেতে দিলাম। একা একা সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ায় কোথায় যে অসম্মান, বুঝি না। কিন্তু অনেকে মিলে দল বেঁধে এলে একটুও বাধে না কোথাও। দল বেঁধে এলে মনে হবে—স্ফূর্তি; একা-একা এলে দারিদ্র্য।

পকেটে দু'টি পয়সাই ছিলো। দুপুরবেলায় ভাগিস্‌ ট্রাম-কোম্পানি ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে—নইলে পিচের রাস্তা ধরে' সশরীরে আর ভবানী-পুরে ফিরতে হ'ত না। কে জানে, হয় ত' এ-ও অপব্যয় করছি। এর চেয়ে দু'টি পয়সা দিয়ে দশটি লজেন্‌চুষ কিনে নিলে ভালো করতাম। কিন্তু কণ্ডাক্টার এসে পয়সা চাইলো। মুখখানা পাঁচের মত করে' গম্ভীর, অন্য-মনস্ক ভাবে জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকেও তাকে এড়াতে পারলাম না।

সকাল বেলা ছোট বোন পদ্মিনী এক পয়সার লজেন্‌চুষ কিন্‌তে না

পেয়ে পাড়ার সমবয়সিনীদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। প্রথমে হাত পেতে ও ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলো, তাতে সুবিধে হ'ল না দেখে গেলো খাম্‌চি দিয়ে কেড়ে নিতে। তবু পারল না। উল্‌টে সবাই মিলে ওর গায়ে কাদা ছুঁড়েছে, চুল ছিঁড়ে দিয়েছে, দু'হাতে এক গাছা করে' যে দুটি খেলো কাঁচের চুড়ি ছিলো তা দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো করে'। শুধু তাই নয়, বলে' দিয়েছে—এমন মেয়েকে নিয়ে আর ওরা লুডো খেল্‌বে না। বয়কট্‌। এই দুঃসংবাদটাই পদ্মিনী মা'র কাছে আনুনাসিক স্বরে বল্‌তে এসেছিলো, মা সশব্দে তার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিলেন। পদ্মিনার সকল কান্না ভয় পেয়ে নিমেষে থেমে গেলো। বিরস মলিন মুখখানির ওপরে দু'টি করুণ চোখের সে অসহায় বিষাদটুকু দূর থেকে আমি দেখেছিলাম।

ভবানীপুরে পায়ে হেঁটে গেলেও বিশেষ ক্ষতি ছিলো না। ছটো পয়সাই বা কম কি।

তক্ষুনি বাড়ি ফিরলাম না। গেলাম কোথায় জানো? সতেরো'র এক নন্দন ষ্ট্রীট। সে-বাড়িতে বিভা বলে' একটি মেয়ে আছে। আগে ও-পাড়ায় আমাদের বাসা ছিলো। বিভার এক দাদার বিয়েতে ও-বাড়িতে খেতে গিয়ে সরু একটা বারান্দার ধারে হঠাৎ একটি মেয়ের আঁচলের চেয়ে আরো খানিকটা বেশি গায়ে লেগে গিয়েছিলো—মেয়েটি এমনি চঞ্চল! কৃশ, লীলায়িত! মেয়েটি দিলো হেসে। সে-হাসির প্রতিধ্বনি করতে একদিন ছাদে এসে দাঁড়ালাম। বিভাও ছাতে এসেছে শুক্‌নো কাপড় কুড়োতে। কাপড় গুলি গুছোল, কুঁচোল; খোঁপাটা খুলে ফেল্‌লো, ফের বাঁধলো, প্যারাপেটএ বুকের ভর রেখে নীচে একবার

ঝুঁক্‌লো, গুন্‌গুনিয়ে একটু চেনা সুরে গান্‌ গাইলো। মনে ভাবলাম আর কী! আমার হৃদয়কম্পন ওর হৃদয়ে গিয়ে লেগেছে। এখন গান জমাবার পালা।

বাড়িটা ফাঁকা; বিভার পাড়ার ঘরে নীচু তক্তাপোষটার ওপর শুয়ে পড়লাম। খানিক বাদেই বিভার প্রবেশ। গায়ে দামি সিল্ক, পিঠের ওপর বেণী। চম্‌কে বল্‌লে: তুমি কখন্?

এই মাত্র। এত সাজগোজের ঘটা?

ম্যাটিনিতে যাচ্ছি গ্লোবে। যাবে ত ওঠ। চটপট্। ভজহরি ট্যাক্সি আন্‌তে গেছে।

আর কে কে যাবে?

নিভা রেবা দিদি দাদু মা পিসেমশাই ছুটকুন্—

ওরা সবাই যাক্। তুমি থাক।

আব্দার! বল্‌তে মুখে বাধে না? এখানে থেকে কি করবো?

কেন, আমার সঙ্গে গল্প করবে। দু'জনে ক্যারম্ খেল্‌বো। বা খেলবো না।

বটে? আর ওরা গ্লোব থেকে লিলুয়ার পিসেমশাইর বাগান-বাড়িতে যাবে, সেখানে খেয়ে-দেয়ে বাগবাজার হ'য়ে—নাও, নাও, তুমি চল না বাপু। অত সাধতে পারি না।

এই শাড়িটাতে কিন্তু তোমাকে ভারি মানিয়েছে। ভারি!

দিদি জন্মদিনে উপহার দিলেন। তুমি ত' কিছুই দিলে না। একটা ফাউন্টেন-পেন দেবে বলেছিলে—মনে করিয়ে দিতে-দিতে গেলাম। দয়া করে' ওঠ দিকি এবার, ভজহরি এসে গেলো।

আমার জামা-কাপড় কি-রকম বিচ্ছিরি ময়লা দেখেছ ? তোমার দিদি নিশ্চয়ই নাক সিঁটকোবে।

বয়ে' গেল। বোঁচা নাক আবার সিঁটকোবে কি ? তার পাশে ত' আর বস্‌বে না। ড্রাইভারের পাশে বোস না-হয়।

তা বসলাম। কিন্তু টিকিটের টাকা ?

যাবে বল, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। লিলুয়াতে গিয়ে আমরা দুটিতে এক ফাঁকে টুপ করে' সরে' পড়বো দেখো। কেউ টের পাবে না।

টের সবাই পেলোই না-বা। একদিন ত' পাবেই। বলে' তার ক্ষীণ কটিটি বেষ্টন করে' কাছে আকর্ষণ করতে গেলাম।

এই নিভা দাশু, মোটর এসেছে। বলে' বিভা ঘুরে গিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফস্ করে' বেরিয়ে গেলো।

হরিশ-পার্কে বসে' অমূল্যর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে উঠলো ! আমার তখন সেই বয়েস যে-সময়ে কিশোরীর একটি স্বেচ্ছাকৃত স্নেহ-স্পর্শকে আসন্ন বিবাহের সঙ্কেত বলে' মনে হয়, এবং এই উপন্যাসটুকু বন্ধুর কাছে খুলে না বল্‌তে পারলে আর স্বস্তি থাকে না। উ... অমূল্য বলেছিলো : মেয়েমানুষ সিগারেটের বাক্সের মধ্যে বিদেশিনী নারীর রঙিন ছবি। একটু চোখ বুলোও, তারপর ছুঁড়ে ফ্যালো। যাকে বলো প্রেম সে হচ্ছে সিগারেট, ধোঁয়া যায় উড়ে', থাকে ছাই। অতএব বৎস, ও দিকে ঘেঁসো না। দশটা পাঁচটা কর, গণ-গোত্র মিলিয়ে কেরানির জন্যে একটি রাণী বাগাও, দু'বেলা রেঁধে দেবেন আর বৎসরান্তে কন্যাবতী হবেন। পাকা সড়ক। অভিজ্ঞ লোক ভাই ; মেয়েমানুষের প্রেম আর চার্লি চ্যাপ্‌লিনের গোঁফ সমান জাতীয়।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হ'ল। মা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন: কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এত রাত্রেও যে বাড়ির বাইরে থাকিস, ব্যাপারখানা কি? পদ্মর কী ভীষণ জ্বর এসে গেছে। মেয়েটা দাদা দাদা বলে' কেঁদে খুন, আর দাদা গেছেন হাওয়া খেতে। ওর জন্যে এনেছিস লজেনচুষ? জোগাড়-টোগাড় কিছু হ'ল আজ?

সুখবরটা জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিলো, কিন্তু শরীরের সব কটা স্নায়ুকে একসঙ্গে শাসন করলাম। সুখ:প্নর স্মৃতি নিজের মনে পর্য্যন্ত লালন করতে নেই, ও এত ক্ষীণায়ু। বল্‌লে পাছে সে-স্বপ্ন আর না ফলে সেই ভয়ে এই নিদারুণ দুরাশার অন্ধকারেও আমাকে স্তব্ধ হ'য়ে পদ্মিনীর পাশে এসে বস্‌তে হ'ল। আঁচলে মুখ ঢেকে মা কাঁদছেন। পদ্মিনী তার কোমল মুঠিটি আমার কোলের ওপর তুলে দিয়ে বল্‌লে,—এনেছ দাদা?

কাল্‌কে নিয়ে আসবো পদ্ম। এত এত। তোমাকে যারা মেরেছে তাদের সবাইকে তুমি অমনি বিলিয়ে দিয়ো, কেমন?

মুখ দিয়ে কথাটা আর বেরুতে দিলাম না। বল্‌লে পাছে না ফলে। খালি নীরবে পদ্মিনীর কপালে হাত বুলোতে লাগলাম।

অমূল্য কোথা দিয়ে যে কী করে' নিয়ে এসেছিলো ঠাহরই করতে পারি না।

ভাদুড়ি তেমনি ব্যস্ত, দু' কলম কি লেখেন আর থেকে-থেকে গলায়

টাই ধরে' ফাঁসটা আরো জোরে টেনে দেন। অতি সন্তর্পণে বল্লাম,—নমস্কার।

মর্ণিং। ও, আপনি? এই দেখুন। বলে' বাঁহাতের মণিবন্ধটা প্রায় আমার নাকের ডগার কাছে এনে ধরলো: দেখুন দেখুন, ভালো করে' চেয়ে দেখুন একবার।

হাত-পা কালিয়ে উঠলো। থমকে চেয়ে দেখলাম ভাদুড়ির রিষ্ট-ওয়াচে বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট।

স্বর্গ থেকে বিদায়!

কিন্তু ভাদুড়িই বল্লেন,—বসুন। পাঙ্কচুয়ালিটি কবে শিখবেন আপনারা?

অত্যন্ত অপরাধীর মত, চেয়ারটা না টেনেই নিঃশব্দে বসলাম। বল্লাম— এই আফিসটা খুঁজতে সামান্য একটু দেরি হ'য়ে গেলো। নইলে এখানে পৌছেছিলাম বারোটার আগেই।

সামান্য দেরি? পাঁচ মিনিট কম হ'ল মশাই? তিন শো সেকেণ্ড এক সেকেণ্ডেও ফোর্ডের কত আয় হিসেব রাখেন? ফোর্ড আলু খায় না জানেন?

মুখ কাঁচুমাচু করে' বল্লাম,—শুনেছি।

হ্যাঁ, আলুটা ছাড়ুন।

স্তিমিত কণ্ঠে বল্লাম,—ছাড়াই ত' উচিত।

ভাদুড়ি ধমকে উঠলেন: একশোবার। শাক ধরুন। শুদ্ধ ভাষায় যাকে ঘাস বলে।

ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ একটু হাসি এনে বল্লাম,—সত্যিও।

নিশ্চয়। আলু খেয়ে আমাদের দেশের থিয়েটারের মেয়েগুলোর বহর দেখেছেন?

হঁ্যা।

থিয়েটারে যান্ নাকি?

ভয় পেয়ে বল্লাম,—একবার ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম; অত শত বুঝিনি তখনো।

কী বোঝেন নি?

ঐ ওদের কথাবার্ত্তা।

কিন্তু নাচউলিদের বহরটি ত' বেশ মনে আছে দেখছি। গায়ে ওটা কি? খদ্দর? এখানে ওসব চলবে না মশাই।

ভাদুড়ি ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করছেন বলে' আশ্বস্ত হ'লাম। বল্লাম,—ওটা খাটি দিশি নয়। বোধ হয় ম্যানচেষ্টারের।

তাই ভালো। এই দেশটা কী? ম্যান আছে কিন্তু চেষ্ট নেই।

বলতে ইচ্ছা হ'ল: আছে ভুঁড়ি। ভাদুড়ির সেই বৃহদায়তন উদরটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

খানিক বাদে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বল্লেন,—নিশ্চয়ই জল হবে।

বোধ হয়। উত্তুরে মেঘ।

মোটেই ওটা উত্তর নয়। উত্তর-পশ্চিম।

হঁ্যা উত্তর-পশ্চিম। উত্তুরে মেঘে ত' খালি ঝড় হয়। ধূলো ওড়ে।

মোটেই নয়। ঝড় হয় দক্ষিণ-পশ্চিমের মেঘে।

হঁ্যা, হঁ্যা। বোকার মত অস্ফুটস্বরে হেসে উঠলাম।

কী দিয়ে দাঁত মাজেন?

ভয়ে ভয়ে বল্লাম,—কয়লা দিয়ে।

তাই মলিনত্বং ন মুচ্যতি।

সংস্কৃতটা শুদ্ধ করে' দিতে পর্য্যন্ত সাহস হ'ল না। জিভ দিয়ে দু'পাটি দাঁত রগড়ে নিলাম।

ভাদুড়ি বল্লেন,—কয়লা মাখলে পায়রিয়া হয় জানেন? পায়রিয়া থেকে ক্যান্সার।

হ্যাঁ হ্যাঁ। যতীন মুখুয্যেরো বোধ হয় দাঁতে কয়লা মেখেই ক্যান্সার হয়েছে।

কে যতীন মুখুয্যে?

ব্ল্যান্ড্ রুইউলের ছোট বাবু—

সে যতীন মুখুয্যে নয়, যতীন মিত্তির। ব্ল্যান্ড্ রুইউল সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে আসবেন না।

কিন্তু তাঁর গলায় যে পৈতে?

পৈতে কার গলায় নেই? বদ্দিরা হয়েছে শর্ম্মা, কায়স্থরা বর্ম্মা, নাপিতরা অবধি নাই-বামুন, পায়ের নোখ কাটবে না। যতীনের ক্যানসার হয়েছে সুপুরি খেয়ে।

হ্যাঁ। ভদ্রলোক রাজ্যের পান খেতেন।

পান খেলে হয় ত পার পেয়ে যেত। চিবোত খালি সুপুরি।

হ্যাঁ, পকেটে একটা ডিবে থাক্‌তোই।

হঠাৎ ভাদুড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন: ব্ল্যান্ড্ রুইউলের যতীনের কি হয়েছে হে, জামাই?

জামাই বলে' ভদ্রলোকটি পাশের টেবিল থেকে বল্লেন,—য়্যাপিন্‌ডিসাইটিস্।

ভাদুড়ি আমার দিকে বাঁকা চোখে চাইলেন: আমিও ত' তাই বল্‌ছি। আপনি বল্‌ছেন কি না ক্যান্‌সার!

দমে' গিয়ে বল্লাম,—হবে।

হবে কি, হয়েছে।

হ্যাঁ। হয়েছে।

পাশের টেবিল্ থেকে জামাই বলে' উঠ্‌লেন: হয়েছিলো। অপারেশান করিয়ে সেরে উঠেছে।

ভাদুড়ি টাইএ আরেক টান মেরে বল্লেন,—তাই। আমিও ত' তাই বল্‌ছি। আপনি দেখ্‌ছি কোনো খবরই রাখেন না। জি পি ও-র গম্বুজে কটা ঘড়ি আছে বলতে পারেন?

তিনটে না?

কোনটার কি টাইম্?

কিছু বল্‌বার আগেই ভাদুড়ি বল্লেন,—হাওড়ার দিকেরটা যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্ রাখে এটুকু খবর রাখেন না? সাড়ে বারো পার্সেণ্টে পঁয়তাল্লিশ টাকায় কত ডিসকাউণ্ট দিতে হ'বে?

একেবারে ঘামিয়ে উঠলাম। ভাদুড়ি বল্লেন,—কাল বাড়ি থেকে হিসেব করে' নিয়ে আস্‌বেন।

কাল আবার আস্‌বো?

ভাদুড়ি চুপ।

কখন আসবো কাল? বারোটার সময়?

ভাদুড়ি মুখ না তুলেই বললেন,—সাড়ে পাঁচটার পর।

সাড়ে পাঁচটার পর? তখন আপনাকে পাবো?

ভাদুড়ি হো হো করে' হেসে উঠলেন: শুনলে জামাই, এ ভদ্রলোক সাড়ে পাঁচটার পর আমার সঙ্গে কাল দেখা করতে আসবেন? আজ কী বার, মশাই?

খুব সাবধানে হিসেব করে' বল্লাম,—শনিবার।

তবে আসবেন কাল। সাড়ে পাঁচটায় কেন, যখন আপনার খুসি।

এমন একটা দিনে একটি নারীর সান্ত্বনা পেতে ইচ্ছা করে। জীবনে তখন তেমন মাত্র একটি নারীর পরিচয়লাভ ঘটেছে। নাম জানো ত'? মনে আছে?

সে আমাকে সান্ত্বনা দেবে বাণীহীন বেদনা-উদাস দুইটি চক্ষু দিয়ে না,—স্পর্শে, সুখঘন উষ্ণ সান্নিধ্যে, শরীররোমাঞ্চে। আমি তখনো তার সেকেলে ছিলাম। বিভার প্রসারিত জঙ্ঘার ওপরে মাথা রেখে একটু শোব, ও ধীরে আমার কানের কাছের চুলগুলিতে একটু আঙুল বুলোবে,—ঘর মৃত হৃৎপিণ্ডের মত স্তব্ধ, আকাশে কৃশ শশীলেখা। একবার শুধু বলবো হয় ত': প্রেমকে দীর্ঘজীবী করে' রাখবার চেষ্টায় বিয়ের মত অশ্লীল একটা কাণ্ড আমরা নাই-বা করলাম, বিভা! বিভার আঙুল ললাট উত্তীর্ণ হ'য়ে ঠোঁটের কাছে এসে এলিয়ে পড়বে।

পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি বিভা ভারি ব্যস্ত।

এই যে, তুমি। এস দিকি এগিয়ে, এই সাবষ্টেন্সটার মাথা কোথায় ল্যাজ কোথায় একটু আলগা করে' দাও ত' শিগগির।

দূরে চেয়ার টেনে বসলাম। বললাম,—ওসবের আমি কি জানি?

যাও, ভারি দেমাক হয়েছে, না? কেন গেলে না কাল? বায়স্কোপ থেকে উর্ম্মিলা-দিকে টেনে নিয়ে গেলাম। ওঁর মত একটা ব্লাউজ-পিস্ কিনে দিতে পারো? দেখবে প্যাটার্ণটা? হঁ্যা, তুমি না দিলে ত' বয়ে' গেল—এই দেখ দিদি কিনে দিয়েছে। ভাববার আগে কলম চলে। বলে' বিভা সবুজ একটি কলম দেখালো।

গোখেল-মেমোরিয়াল্এ কাল আমরা নাচবো, টকিতে গান দেবো, ইচ্ছে করি ফিল্মএ নামি। হারিয়ে দেবো—গ্রিটা গার্‌বোকে,—ঠিক, তুমি দেখো। আমার চোখের পালকগুলি অমনি লম্বা নয়? কি বল? বলে' বিভা টেবিলের ওপর থেকে একটি ছোট আয়না আলোর দিকে তুলে ধরলো।

তার পর অস্বচ্ছস্বরে: বাবা মহা মুস্কিল বাধিয়ে তুলেছেন। বলছেন, শিগগির নাকি আমার বিয়ে। এত নেচে কি না এখন আমি আছাড় খেয়ে পড়ি। ছেলে হ'লে ঠিক পালিয়ে যেতাম। তোমাদের কী মজা, কেউ জোর খাটাতে পারে না। আচ্ছা, তুমি ত' একটি অকর্ম্মার ঢেঁকি, ছাতে উঠে খালি পাশের বাড়ির মেয়েকে হাতছানি দাও—একটা কাজ কর না। আমাকে পিসিমার বাড়ি পৌছে দিয়ে আসতে পারো? চাটগাঁয়? ভারি মজা হয় কিন্তু। বলে' বিভা নিরুৎসাহ ভাবে হেসে উঠলো।

আমি কিন্তু তা বলে' পড়া বন্ধ করতে পারবো না। বাবা ওঁদের

কাছ থেকে সে গ্যারিন্টি এনেছেন—না এনে যাবেন কোথায়? অত সহজে হাল ছেড়ে এলিয়ে পড়বার মেয়ে নই। আমার বিয়েতে তুমি একটা পিক্‌চার য়্যালবাম্ দিয়ো—সেই যেটাতে তোমার 'দান্তের স্বপ্ন' আছে। দাঁতের স্বপ্ন, না অজিতদা?

অনেক পরে বলতে পেরেছিলাম মনে আছে : চাট্‌গাঁয় যাবে?

বিভা তার 'টেষ্ট-পেপারের' পৃষ্ঠা উল্টে বল্‌লে,—কবেই বা যাই? পরশু আবার এক্‌জামিন্, মিস সোম একটা ছুঁচি। না বাবা, এক্‌জামিন আমি দেবই দেখো। কেন, চাঁটগাঁয় তোমার কেউ আছে বুঝি?

না, কে আবার থাক্‌বে!

শোন্, বন্ধুদের কি বলে' নেমন্তন্ন-পত্র ছাপাই বল ত'। তোমার ত ভাবা-টাবা আসে শুনেছি। একটা লিখে দিয়ে যেয়ো, কেমন? নমিনেটিভ্ পেছনে রেখে ভার্বটা আগে পাঠিয়ে কী করে' যে সবাই লেখে ভেবে উঠতে পারি না। বাবা, পরীক্ষায় ও-সব খাটবে না কিন্তু। চললে? এসো কিন্তু কাল—লেখা নিয়ে।

রাস্তায় অনেকটা এগিয়েছি; পেছনে থেকে বিভা ফের ডাকলো: অজিতদা, শোন।

ফিরলাম।

বিভা বল্লে,—মা বললেন মিষ্টি-মুখ করে' যেতে। খালি-পেটে অমন একটা শুভ সংবাদ শুনে যেতে নেই।

আশ্চর্য্য। সামনে টেবিল টেনে চেয়ারে বস্‌লাম। টেবিলের ওপর একথালা মিষ্টি। সারাদিন শ্রান্তিতে ভারি খিদে পেয়েছিলো।

অধিবাস

এখন সেই কথাই মনে হচ্ছে,—প্রেমের চেয়ে বড়ো হচ্ছে ক্ষুধা, আত্মার চেয়ে দেহ। তোমারো কি তাই এখন মনে হয় না?

অমূল্য প্রতিশোধ নিলো ভাদুড়ির ওপর। অর্থাৎ তাঁর কন্যাকে সে শয্যাসঙ্গিনী করলে না।

ওর ত' আর চাকুরির ভাবনা নেই। বাপের দেদার পয়সা, অলস হ'য়ে ভোগ করতে ওর বাধে বলে'ই ও দালালি করে, লাইফ্ ইন্‌সিয়োরেন্সের মক্কেল বাগায়।

প্রেম করতে এসে আগে চায় চোখের দেখা, তারপর দু'টি মুখোমুখি কথা, একটু স্নেহাভাস, একটু ক্ষণ-সান্নিধ্য, তারপর একটু ছোঁয়া—শাড়ির, আঙুলের, অধরের। অধর ডিঙিয়ে বুক, তারপর সর্ব্বাঙ্গ। আরো চাই তবু। সন্তান, এবং বংশের ভিতর দিয়ে অবিনশ্বরতা। এই না প্রেম!

অমূল্যও তাই আরো চায়। চায় নগদ টাকা, দান-সামগ্রী, মোটর-সাইকেল—কত-কি! চায় বিভাকে।

তার পর—আরো বলবো? তার পর সব ত' তুমি জানো।

বিয়ের বাজনা ভেদ করে' অমূল্যর একটা কথা কেবলই আমার কানে বাজছিলো: কৃতজ্ঞতাটা আরো ওপরে পৌঁছে দাও!

কৃতজ্ঞতা আরো ওপরে পৌঁছে দিলাম।

অধিবাস

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে যে-সঙ্গিনীটির কাছে আমি আমার জীবনের গল্প বল্‌ছি—সে সহসা আমার বক্ষলগ্ন হ'য়ে মমতাময় কণ্ঠে বল্লে,—এখন থাক, রাত কম হয় নি। এবার ঘুমোও।

নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে বল্লাম,—আজকে, সতেরোই শ্রাবণই ত' তোমার বিয়ে হয়েছিলো, তারিখটা মনে নেই বিভা? সে-রাত্রে কি আমি আর ঘুমুতে পেরেছিলাম?

বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বিভা প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে,—কিন্তু আজ ঘুমোও।

ঘুমোব। একটা মজার গল্প শোন। দোল্‌নায় খুকিকে দু'টি ঠেলা দিয়ে এস। বেচারাকে মশা কামড়াচ্ছে।

বিভা খুকিকে দোলা দিয়ে আমার কাছে এসে আবার শুল। হঠাৎ উঠে পড়ে' বল্লে,—খুকিকে নিয়ে আসি। ওর খিদে পেয়েছে। পুরোনো কথা শুনতে এখন ভারি ভালো লাগে—

বিভার বুকে খুকি, আমার বাহুর ওপরে ওর মাথাটি এলানো। ওর শীর্ণ দেহটি যেন নিস্তরঙ্গ নদী, মাতৃত্বমণ্ডিত মুখখানিতে পবিত্র গাম্ভীর্য!

শোন, কী মজা—

গল্প আবার সুরু করি।

অধিবাস

আমার আফিসে একদিন ভাদুড়ি এসে হাজির। জটাজুট দাড়ি গোঁফ তখন নির্ম্মূল হ'য়ে গেছে। চিন্‌তে পারলেন। ইঞ্চি দুয়েক হাঁ করে' বল্লেন,—অজিতানন্দ স্বামীজী এখানে থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই। কি দরকার বলুন। ওরে কে আছিস্, একটা চেয়ার দে সাহেবকে।

ভাদুড়ি আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্লেন,—আপনি—আপনি—

হ্যাঁ, আমিই একদিন আপনার আফিসে বছর দশেক আগে উমেদারি করতে গিয়েছিলাম। কী চান্? আমাদের চামড়ার এজেন্সি?

ভাদুড়ি একেবারে হাঁপিয়ে উঠলেন, যেন লাক্ষ্ণৌর ইমামবড়ার গোলকধাঁধায় এসে পড়েছেন, হাতে টর্চ নেই। বল্লেন,—আপনি না সংসার ত্যাগ করেছিলেন?

হেসে বল্লাম,—চিরকাল সরে বলে'ই ও' সংসার, যা সরে তাকে ত্যাগ করা যায় না। আপনি যদি সরেন, সংসারো কাছে সরে' আসে। কেনোপনিষৎ পড়েছেন?

কিন্তু সন্নেসির এ কী ঠাট? তিন আঙুলে আঙটি? গায়ে সিল্ক? ঘাড় চাঁছা? এ কী প্রবঞ্চনা?

প্রবঞ্চনা না করে' কোনো ব্যবসায় বড়ো হওয়া যায় না। সে-কথা থাক্, কী চান্ শুনি? চাক্‌রি না এজেন্সি?

সে-কথা পরে হচ্ছে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে' আবার আপনার কি দুর্ম্মতি হ'ল?

হুঁ, এমনি মজা। কামিনী-কাঞ্চন এম্‌নি পিছল জিনিস মশাই, ছাড়লেই আঁকড়ে থাকে। কামিনী আর কাঞ্চনের জন্যেই কামিনী-

কাঞ্চন ছেড়েছিলাম। তা, হ'লে পেন্টালুনটা একটু তুলে চেয়ারটায় বসুন।

ভাদুড়ি বস্‌লেন। মুখে বিরক্তি, অথচ ভয়।

বল্লেন,—আপনি অমূল্যর বৌকে চুরি করেছেন?

অমূল্যই বরং আমার বৌকে চুরি করেছিলো।

আপনার বৌ?

ব্যাপারটা বল্‌ছি, বসুন দয়া করে'।

আপনি দিলেন না চাকরি, অমূল্য বিভাকে কেড়ে নিলো। তবু কৃতজ্ঞতা আপনাদের ডিঙিয়ে আরো ওপরে পৌছে দিলাম। কপালে কাট্‌লাম ফোঁটা, মাথায় রাখলাম টিকি। দাড়ি কামাতাম না, হাতের নোখগুলি স্বচ্ছন্দে বাড়তে দিলাম। কম মহড়া দিতে হয়নি মশাই, ভাতের ওপর তুলসী পাতা রেখে খেতে বসেছি, খাওয়ার শেষে পিপ্‌ড়ে আর কাকদের জন্যে অতিথিশালা খুলেছি। তারপর যখন তিন পয়সায় দাড়ি ও ছ'পয়সায় চুল কাটাবার মতন সময় পেরিয়ে গেল, কাছা নামিয়ে ববম্‌-বম্‌ বলে' বেরিয়ে পড়লাম।

একটি দুটি বছর নয় মশাই, নটি বচ্ছর সমানে। হরিদ্বার থেকে রামেশ্বর। কত রকম আসন, কত রকম হোম, কত নতুন উপচার! তারার দিকে, বিড়ালের চোখের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিপনটিজম্‌ শিখলাম—গুরুও জুটেছিলেন একটি। আপনার মতন ভুঁড়ি, যদিও আলু খাননি কোনোদিন। কাক-চরিত্র, কোকিল কথন—কত-কি!

ভাদুড়ি টেবিলের ওপর কনুয়ের ভর রেখে বল্লেন,—অজিতানন্দ

স্বামীর নাম ত' ভারতবর্ষে হু-হু করে' চল্‌ছিল, কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছেন—

হোমিওপ্যাথি জানতাম যে। জল ছুঁয়ে দিয়েছি, রুগী নিজের উইল্‌-ফোর্সে সেরে উঠেছে। শুধু কি তাই? স্ত্রী এসেছে স্বামীর বশীকরণ মন্ত্র শিখতে, বাৎসায়ন পড়িয়ে দিয়েছি; বন্ধ্যা নারী এসেছে পুত্র-কামনা করে', বিফল-মনোরথ হয় নি কোনোদিন। বলে' একটু হাস্‌লাম।

আগাগোড়া আপনি জান্‌তেন যে জোচ্চুরি করছেন?

সন্নেসি দূরের কথা, স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত জানেন না।

কিন্তু অমূল্যর বৌকে কোথায় পেলেন?

আমার বৌকে বলুন। পেলাম চুঁচড়োয়। এক বটগাছের গোড়ায় সিঁদুর মাখিয়ে ত্রিশূল গেড়ে ভস্ম মেখে ধুনো জ্বেলে লোহার শলার ওপর বসেছি—লোকে লোকারণ্য। কেউ টিপছে হাঁটু, কেউ কব্জি, কেউ বা জটায় আমার স্যাম্পু করছে। অসংখ্য লোক হামাগুড়ি দিয়ে জ্যান্ত বটগাছকে প্রণাম করছে। কেউ দিচ্ছে ফল, কেউ দিচ্ছে পয়সা। স্তূপাকার।

সেদিন আকাশে খুব মেঘ। উত্তর-পশ্চিমে নয়, ভাদুড়ি,—পুবে। আসর বুঝি জমে না। ধূলোতে ফুঁ দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিলাম, মেঘ গেলো ভেসে। মেঘের ফাঁকে সোনার আলো ঝিক্‌মিক্‌ করে' উঠলো।

সেই সোনার আলোয় বধূবেশে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো কুণ্ঠিতকায়ে, অভিমানিত, নমিত দৃষ্টিতে। প্রথম তারাটি দেখলে তার

কথা তখনো মনে পড়তো।, চিন্‌তে কি আর ভুল হয়? বল্লাম,—যদি সবাইর সামনে তোমার মনের কথা বলতে ভয় হয়, তোমার মাকে নিয়ে রাত্রে এসো। ঐ আমার কুঁড়ে বেঁধে রেখেছি। ঐ যে।

মেয়েটির ভাগ্যে সবাই ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠল। ওর সঙ্গিনী ঐ প্রৌঢ়াটি যে ওর মা, আমার এই জ্বলন্ত সত্যবাদিতায় বিভা আর তার মা বিস্ময়ে ভক্তিতে অভিভূত হ'য়ে পড়লো। দুটো পা দু'জনের মাথায় চাপিয়ে পদধূলি দিলাম।

রাত্রে আবার ওরা এলো। আমার খড়ের ঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সামনে হোমকুণ্ড, নিবন্ত। বিভার মুখে কথা বেরয় না, খালি কাঁদে। চেহারাটা রোগা, কাহিল, মুখে বঞ্চিত আশার কালিমা মাখা। ওর মাকে বল্‌লাম—কী ব্যাপার? অমূল্য বুঝি খুব খারাপ ব্যবহার করছে?

আমার মুখে অমূল্যর নাম শুনে দু'জনে চমকে উঠলো। মা বল্লে,—সত্যি কথা বাবা, সেই বিয়ের সময় থেকে পাওনা-থোয়া নিয়ে গোলমাল ওদের আজো চুকলো না। কর্ত্তা সর্ব্বস্বান্ত হলেন, তবু ওদের খাক্ মিটে কৈ? মেয়েটাকে ধরে' মারে, মেরে মেরে বাছাকে আমার চামড়া-সার করে' তুলেছে।

বিভাকে বল্লাম,—কি চাও বাছা? স্বামীর প্রেম?

বিভা শুধু বল্লে,—মুক্তি।

বল্লাম—তথাস্তু। কালকে তুমি একলাটি একবার এস বিভা।

ভাদুড়ি বাধা দিলেন : তথাস্তু মানে? অমূল্যকে আপনি মারলেন?

জিভ কেটে আমি বল্লাম,—ছি! আমি মারবার কে? মারলো ওকে মদ, লিভারের ফোড়া। আরো যত রাজ্যের রাজকীয় ব্যাধি।

আপনি ভগবানের কাছে ওর মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করলেন? স্তব-স্তুতি হোম পূজো?

তা একটু করলাম বৈ কি। এতদিনেও যদি সাংসারিক না হই, তা হলে আর কি শিক্ষা হল বলুন।

তার পরে একলা ও এলো?

শুধু সেই রাত্রে? রোজ। না এসে করে কী! টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন না?

আপনাকে চিনলো?

দরকার নেই। ততদিনে ছেলেবেলার সেই অস্বাস্থ্য কাটিয়ে উঠেছি। বল্লাম,—সেকেণ্ড ক্লাশে পড়বার সময় একজনের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলে, মনে আছে বিভা? বিভা পায়ের ওপর মাথা রেখে বল্লে,—তখন তার সেই অনুচ্চারিত প্রেম বিশ্বাস করিনি, ঠাকুর।

আজ করবে? বলে' তাকে সহসা বাহুর মধ্যে টেনে আনলাম। বিভা শিবদেহলীন পার্বতীর মতো নিমীলিত চক্ষে সে স্পর্শবন্যায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো।

টাই টেনে ভাদুড়ি বল্লেন,—তার পর?

তার পর যখন সে আবার ফিরলো, চেয়ে দেখলাম আমার চুম্বনে তার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। তিন টাকা খরচ করে' কলকাতায়

সেলুন থেকে লুকিয়ে দাড়ি চুলের জঙ্গল সাফ করে' নিলাম। বিভা অবাক হয়ে গেল : তুমি ? অজিত ?

তাকে কাছে ডেকে এনে কানে কানে বল্লাম,—অজিতানন্দ।

ভাদুড়ি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল : আপনার মতন স্কাউণ্ড্রেলটার সঙ্গে ও এলো ?

না এসে করে কী ভাদুড়ি? বিভা তখন মাতৃত্ব-সম্ভাবনায় মহিমাময়ী।

•

গল্প থামিয়ে বল্লাম—খুকির কি নাম রাখা যায় বল ত' ?

বিভা খুকির চুলগুলিতে হাত বুলুতে বুলুতে বল্লে,—সীতা। বসুমতী ওকে উপহার দিয়েছেন।

বল্লাম,—না। নুরজাহা। জন্ম ওর পথে নয়, নেপথ্যে।

বিভা বল্লে,—হ্যাঁ, তারপর ?

ভাদুড়ি তোমাকে-আমাকে গালাগালি দিয়ে বহুল পরিমাণে থুথু ছিটোতে লাগ্‌লো। বল্লাম,—সিদ্ধিটাই বড়ো, ভাদুড়ি, রীতি নয়। বিভাকে পাওয়া ছিলোই আমার তপস্যা। ওকে কলঙ্কিনী বলুন ক্ষতি নেই, আমার প্রেমে ওর সে কলঙ্ক মুছে দিয়েছি।

ভাদুড়ি বল্লে,—এত বড় চামড়ার কারখানা খুললেন কী করে' ?

—স্রেফ হোম করে'। কতগুলি ভস্মই আমার মূলধন। এক মুঠো ছাই নিয়েছি আর সোনা হ'য়ে গেছে। কিন্তু আপনি কি মনে করে' এসেছেন ? যদি পারি ত' নিশ্চয় উপকার করবো। বলুন্।

ঢোঁক গিলে ভাদুড়ি বল্লে,—এসেছিলাম একটা ওষুধের জন্যে। তা—

ওষুধ? কিসের? ভুঁড়ি কমাতে হবে? আলু খাওয়া ছেড়ে টোমাটো ধরুন।

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে-করতে ভাদুড়ি বেরিয়ে গেলো।

মাঠ ও বাজার

রেল-রাস্তা পেরলেই মাঠ,—সমস্ত হাওয়া একচেটে করে' রেখেছে। এদিকে ঘিঞ্জি সহরতলি দোঁকে,—নভ গন্ধে পুঁয়ে-পাওয়া সহর।

আর, কা'র জন্যই বা হাওয়া? দুটো চারটে দানো অশ্বত্থ গাছ, মাটির বুকের দুধ খেয়েই টনকো মজবুত,—আর দুটো চারটে কাঁচা পুকুর, একটা হিংচে শাকও ভাসে না তাতে, না বা কলমি লতা। কয়লার গুঁড়োতে কালো-করা রাস্তার ধারে একটা ডাক-বাংলো,—তা থাক আর শেষ প্রান্তে একটি সাধাসিধে বাড়ি,—তাতে এক ফক্কর ছেলে থাকে, এই সবার বলবার ধরণ। এই মাঠটা এত দিন সুখেন্দুর কাছে ছিল বোজা পুঁথি, সুদূরের ধোপা-পটিটার মতোই তুচ্ছ, চিরদিনকার পরিচিত বলে'ই নিরর্থক। কিন্তু এই মাঠের দিকে চেয়েই না সুখেন্দুর তেপান্তরের কথা মনে পড়ে! পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা হাওয়ার এই উদ্দাম দুর্বিনীত বেগ দেখে। ও যেন হঠাৎ একদিন এই মাঠ ও বাতাস আবিষ্কার করে' ফেল্লে।

বাজারে তাল-পাতার পাখার দাম চার পয়সা করে'। দোকানি

বকুনি খায়,—কে শাসিয়ে শুনিয়ে যায়—পাৎলা পতপতে একটা পাখা, দু'বার হাতে ঘোরালেই মচকে যায়। চার পয়সা না হাতি—

দোকানি বলে—ওটার দাম দু' আনা, সমস্ত রাত বসে' বসে' ওগুলোতে লাল কালির ফুট্‌কি দিয়েছি।

হাওয়াও ত আর মাগনা খাওয়া যায় না। আকাশের রূপালি আলোটুকু পর্য্যন্ত রূপোর ঘুষ দিয়ে ঘরে আন্‌তে হয়। না ডাকলেও যে আস্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠা করে না, সে মৃত্যু,—চোরের মত চুপি-চুপি আসে না, ডাকাতের মতো ধমক দিয়েই আসে, বলে: আরেক জনের রাস্তা খোঁড়বার চাকুরির সুবিধে করে' দিয়ে গেলাম, রোদে সে পিঠ পাতুক!

নৃসিংহ ওর বউকে বলে—তেতে-তেতে গা আম্‌সি হ'য়ে গেল,—কল্‌সি শেষ হ'য়ে গেছে। পুকুরটা এক ঢোঁকে গিলে ফেলতে পারি, জানিস্? তোর এই বাসন-পেটা'র চেয়ে আমার জেলে-নৌকো ঢের সুখের ছিল। ছই'র ওপর চিৎপাত হ'য়ে—দিব্যি—

বৌ বলে—বাতাস ছিল বটে, পয়সা ত ছিল না। তারপর একদিন ঝড় উঠুক,—ডিঙিটা ডিগবাজি খাক! আরেক ঘটি জল খেয়ে নাও, দাওয়ায় না হয় চাটাই বিছিয়ে দিচ্ছি।

দাওয়ায় নয়, কেউ কেউ আবার পথের পারে শোয়। সমরু সেই যে ঘুমিয়েছিল ভোর হ'তে আর দেখেনি, রোদের আদরও পায় নি আর,—ওকে কেউটে কেটেছিল। লেখরাজ মরেছিল ডিপথেরিয়ায়। ওর বৌ নাকি বলেছিল—এ সব ব্যামো শুধু বড়লোকদেরই হয়।

ব্যাধিজীর্ণ বুড়ো থুথুড়ো সহর ঐ তাজা সবুজ অগাধ মাঠের দিকে ভিজা চোখে চেয়ে থাকে। হুলো বাড়িয়ে ডাকে, মিনতি জানায়।

অধিবাস

বাসন-পেটা'র আওয়াজ বজ্রের মতো প্রচণ্ড বলে'ই হয়ত পটিটার নাম ঠাঠারি-বাজার। বাসন পিটিয়ে ভোরাই, সাঁঝাইও বাসন পিটিয়ে, —এক নাগাড়ে রাত দশটা নাগাদ।

তার ওপর ত' রেল-রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িগুলি দিন-রাত পায়চারি ক'রে বেড়ায়-ই। ওদের যেন জিরোবার কথা নয়।

পল্টনের মাঠের সঙ্গে ঠাঠারি-বাজারের কথা চলে। যখন রাত এক-টার পর ঘণ্টা দুয়েকের জন্য রেল-ইঞ্জিন্ হার্ট ফেল করে' চুপ করে' থাকে। কি কথা হয়? মাঠ বলে—আমি ভারি একা, একেবারে বাজে; বাজার বলে—আমিও।

নিশীথ রাতের ঐ স্তব্ধতাটুকুর অবগুণ্ঠনের তলায়ই যা ওদের দুয়েকটি কথা। তারপর সেই অকূল অপরিচয়।—মাঠ যেন সংসারনিকেতনের সব্রীড়কটাক্ষা লক্ষ্মী নববধূ, আর ও যেন বারবনিতা।

সারা দিনে আর ওদের বনাবস্তি নেই।

'লোকাল-বোর্ডে'র মেম্বাররা তো কেউ আর কবি নন্, নইলে বাজারের নাম বদ্‌লে দেওয়া উচিত ছিল। যেদিন বলা-কওয়া নেই রুকমা ডালিমফুলি ফিনফিনে কাপড় পরে' এই পাড়ায়ই একটা ক্ষুদে ঘর ভাড়া নিয়ে বসল—পান বেচতে।

অনেক রাতে ওঠে কৃষ্ণপক্ষের যে মলিন চাঁদ,—রুকমা যেন সেই আলোটুকুর মতোই স্নিগ্ধ। কিম্বা ও যেন বিকালের আলো,—পড়ন্ত

বেলার রোদ। যৌবন যেন এই মাত্র এক্ষুনি ওর পুরন্ত দেহ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে,—এমনি মনে হয়,—ওর দুই চোখে চটুল যৌবনের কৌতূহল এখনও একটু টলটল করছে,—গান ফুরিয়েছে বটে, কিন্তু রেশ মিলায় নি। ওর দুই টুকটুকে ঠোঁটে যেন ফুলের পুঁটলি বাঁধা।

ঠাঠারি-বাজারের অদৃষ্টে এমন অসম্ভবও তা হ'লে ছিল। চিরকাল বাসন-পেটানোতে অভ্যস্ত সবাইর কান হঠাৎ একদিন আকস্মিক পুলকে যদি খাড়া হ'য়ে ওঠে, যদি দু'মিনিটের জন্যও কারো হাতের হাতুড়ি চলে না—তবে? নৃসিংহই প্রথমে আলাপ করতে গেল যা হোক।

রুকমা অল্প একটু হেসে বল্লে—এই, একটা দোকান খুললাম। তোমরা মেরামত কর, আমি না হয় ভাঙি।

নৃসিংহ বলে—কোথায় ছিলে আগে?

রুকমা দোপাটির দেউটির মতো হাসে। বলে—সে জেনে লাভ নেই। এখন এখেনে।

নৃসিংহ বলে—দোকান চলবে না হেতা—

রুকমা আবার হাসে, যেন না হাসলেই ওর নয়, বলে—চলে যাবে।

পরে ফের শুধোয়—এই ত' সহরে যাবার চৌমাথা? ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে হবে সব।

মাচার ওপর বসে' পান সাজে, আর আপন মনে হাসে—ঐ হাসি দেখে খরিদদারেরা সবাই ভাবে পানগুলি বুঝি সম্ভাষণ করে' গোপনে ওদের কিছু বলতে চায়, একটু সচকিত হ'য়ে ওঠে। খানিকদূর গিয়ে আবার চুণ চাইতে ফের ফিরে আসে। তেমনিই হাসে বটে রুকমা, কিন্তু কেন হাসে, কেউ শুধোয় না।

যখন ভিড় থাকে না, হাসে তখনো। সে-হাসি যেন দিনান্তের দুর্বল দুঃখী হাসি। পান বেচবার এক ফাঁকে ও যেন ওর প্রাণও বেচে ফেলতে চায়। যেন বাঁচে তা হ'লে।

পাড়া-বেড়ানোর ওস্তাদ সুখেন্দু,—আর্ম্মানিটোলা থেকে গ্যাণ্ডারিয়া পর্য্যন্ত,--মাঝে মাঝে দু' একবার লক্ষীবাজারে একটা বেঢপ ফটক-ওয়ালা বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়। সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সময়মাফিক দু একটি কথা কয়,—আর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চা দিতে এসে তাপসী যদি ওরও খুব কাছে এসে ওকে এক পেয়ালা চা করে' দেয়, সবাইকে গান শোনাবার সময় যদি এমন হয় গানের একটি কথা খালি ওরই বোঝবার জন্ম! ওর কৌতূহল অসীম, বেস্পতিবার তাপসী পেঁয়াজি শাড়ি পরেছিল, শুক্রবার নিশ্চয়ই ঘাস পরবে, সেদিন পরেছিল মান্দ্রাজি ঢঙে, আজ নিশ্চয় গুজরাতি। সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে কি ঢঙে কথা কইবে ঘাড় বেঁকিয়ে, ভূপেশ-বাবুর 'টাই'র দিকে চেয়ে-চেয়ে কেমন হাসবে মৃদু-মৃদু, প্রসন্নবাবুর হাতের থেকে পদ্মের কুঁড়িটা নেবার সময় কেমন কাঁকন দুটো ঘুরিয়ে একটা ভলো 'থ্যাঙ্কস' দেবে—তাই দেখবার ওর অগাধ সাধ। এই সব ফতো বাবুদের বাঁদরামি দেখতে, আর তাপসীর কেতা-দুরস্তি। সুখেন্দুর মজা লাগে।

কিন্তু তাপসীর ওপর ওর কেন-যেন টান আছে একটা। সে-টান কাছে আন্‌বার জন্ম টানে না কোনোদিন, শুধু মনের মধ্যে একটি

অনির্ব্বাণ মমতা জাগিয়ে রাখে। তাপসীকে ওর কৃত্রিম মনে হয় বটে, ঠুনকো কাঁচের দামি পেয়ালা তাতে ফুল-কাটা,—কিন্তু ওর ঐ দুটি সহজ সরল কালো চোখ ইচ্ছা করলেই ওর চোখের দিকে এমন স্নেহে তাকাতে পারে যেমন ও কোনোদিন প্রসন্নবাবুর দিকে তাকায়নি। ওরা যদি সব চলে' যায়, তবে নিশ্চয়ই তাপসী ওর পাশে এসে বসে একটু যা-তা বাজে গল্প করে খানিক,—রোজকার মত চা এনে দিতে নিশ্চয় আর মনেই থাকে না। মনে মনে সুখেন্দু তাপসীর মনের তাপ অনুভব করে।

কি-ই বা সুখেন্দু? আই, এ-তে দু'বার ফেল্‌ করে' কোনরকমে টায়ে-টুয়ে নম্বর রেখে উঠেছে বি, এ ক্লাশে;—প্রসন্নবাবুর মতো না আঁকিয়ে, না-বা অভিজাত লিখিয়ে সঞ্জয়বাবুর মতো। গোঁয়ারের মতো আর্মানিটোলা ক্লাবে ফুটবল খেলে,—রাইট্‌-আউট্‌,—পায়ে খালি বোঁ-বোঁ করে' বল্‌ নিয়ে ছুটতে আর সেণ্টার করতে,—স্কোর করতে শেখেনি। ইস্কুল থেকে বদ্‌ অভ্যাস নস্যি নেওয়া,—বৌদি দুটোকে বলে' বলে' হায়রান্‌ হয়েও জামা-কাপড়ের ফুটোগুলো আজো পর্য্যন্ত বোজাতে পারেনি,—একদিন ত' ছিটের একটা কোটের ওপর শাদা চাদর জড়িয়েই এসেছিল অজবুকের মতো। জামার হাতায় মুখ ঢেকে প্রসন্নবাবু হেসেছিলেন, আর সঞ্জয়বাবু হেসেছিলেন রুমাল মুখে পুরে। শুধু, তাপসীই সেদিন ঠাট্টা করেনি, চামচ নিয়ে এগিয়ে এসে বলেছিল—আর একটু চিনি দেব সুখেন্দু বাবু?

সুখেন্দু বলেছিল—দিন্‌।

বোকার মতো ও আবার চায়ে চিনি বেশি খায়। ওদের মতো শব্দ না করে'ও খেতে পারে না।

আসর জমা'র পর এককোণে এসে বসে, আসর ভাঙবার আগেই জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ করে' চলে যায়। সঞ্জয় বলেন—ইডিয়ট্‌; প্রসন্ন বলেন—স্নব।

ও তবু চলে' যায়। তাপসীর গানের একটা পদ ছিল—যাবার তরেই তার আসা গো, ভেসে যাওয়াই ভালবাসা। অবশ্য তার জন্যই নয়।

ক্লাশের ঘন্টা বেজে গেছল অনেকক্ষণ, কিন্তু মাষ্টার একটা কবিতা পড়াতে পড়াতে এমন মেতে উঠেছিল যে, হুঁসই ছিল না তার—সুখেন্দু ওর জুতোটা মেঝের ওপর ঘষল বার চারেক, বইগুলি বেঞ্চির ওপর ফেলতে লাগল শব্দ করে' করে'।

মাষ্টার তাই চটে' একচোট বকুনি দিয়ে উঠলেন,—শেলির প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই এতটুকুও, সে যেন কাল থেকে আমার ক্লাশে আসে না।

ভালো ছেলেরা সব সায় দিল ও বিরক্তিভরে ওর দিকে তাকাল রূঢ় চোখে।

—আজ থেকেই স্যার্‌। সালাম্‌ শেলিকে—

বলে'ই সুখেন্দু একেবারে লক্ষ্মীবাজারের মুখে পাড়ি দিল।

মোট কথা ভোর বেলা থেকেই সুখেন্দুর মন মৌমাছির মতো গুনগুন্‌ করে' ঘুরছে। হঠাৎ,—অতি হঠাৎ, মনে পড়ে' গেল দুপুর বেলা তাপসীর বাড়ি গেলে কি হয়? কেন?—বেশ হয়। কি আর

হ'বে ? হয়ত শুনব, ঘুমুচ্ছে, দেখা করবে না,—কিম্বা যদি দেখা করে'ই বলে—কি চাই ? তা হলে ? সোজা বলব—আলাপ করতে চাই। ভারি বেখাপ্পা শোনাবে। শোনাক্। সত্যি, ওর সঙ্গে আলাপ কর্‌তেই ত' চাই,—কিই বা আলাপ ? এই কলেজের কথা, বৌদিদিদের ঝগড়ার কথা। আমাদের মাঠটার কথা,—এই লক্ষ্মীবাজার টিম্‌কেই হাফ্-টাইমে পাঁচ গোল দিয়েছিলাম—সে কথা। ভারি হবে, না হয় বড় জোর বল্‌বে—আর এসো না এ বাড়ি। তাই বলুক।

ধোপা ত' আজই কাপড় দিয়ে গেছে,—পরে' আসতে পর্য্যন্ত মনে ছিল না। কি হবে ধোপ্-দুরস্ত হ'য়ে ? আমি শুধু দূরে বসে' ওর সঙ্গে দুটি কথা কইব, প্রসন্নবাবুর আর্ট বা ফ্লার্ট সম্বন্ধে নয়,—এম্‌নি, যা বলে সবাই, যা সচরাচর তাপসী শোনে না।

কড়া নেড়ে-নেড়ে ডাকল—মোহিত ! মোহিত !

তাপসীই উঠে এসে দরজা খুলে দিলে যা হোক্। বল্লে—মেজদা ত' কলেজে।

—ও ! আমি তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে ? এস তা হলে। একেবারে ওপরে চল, একটা ভারি সুন্দর টেবল-ক্লথ তৈরি করছি।

সুখেন্দু বেমালুম ওপরে উঠে গেল। যেন ওর সমস্ত কোণ-ঘুঁজি পর্য্যন্ত জানা আছে। দোতলায় যে ঘরে তাপসী থাকে, সে ঘরটা যেন ওর কতকালের চেনা। একেবারে একটা ইজি-চেয়ারে কাৎ হয়ে বল্লে, —এক গ্লাশ জল দিতে পার ?

তাপসী ওর শাড়ির আঁচলটা লুফতে লুফতে বেরিয়ে গেল। কাঁচের

গ্লাশে করে' সরবৎ তৈরি' করে' আন্‌লে। বল্লে—একটু জিরিয়ে নাও, পরে খেয়ো।

সুখেন্দু বল্লে—কি দারুণ রোদ, মাথার রগ দুটো ছিঁড়ে পড়ছে।

তাপসী বল্লে—দক্ষিণের জান্‌লাটা খুলে দিচ্ছি। সেলাই ফেলে ঘুমুচ্ছিলাম কি না, তাই সব ভেজানো ছিল। ছাই, এক ফোঁটা বাতাস নেই। দাঁড়াও, হাওয়া করে' দিচ্ছি—

সুখেন্দু বারণ করল না বা করতে পারল না। চোখ বুজে রইল, পাখা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি তনু হাতের কঙ্কণ-কিনিকিনি শুনতে লাগল, যে দুটি হাত ও ছোঁয়নি, যে দুটি হাত ও জীবনে কোনদিন ছোঁবে না, যে দুটি হাত—

—এই বারে খাও সরবৎটা। বরফও গ'লে গেছে।

এক চুমুকে গিলে ফেলে সুখেন্দু বল্লে—তোমার টেবলক্লথ দেখালে না?

তাপসীর হাতে দিতে গিয়ে যাতে পাছে তাপসীর আঙুলগুলি ছোঁয়া যায় তাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে গিয়েই গ্লাশটা পড়ে' টুকরো হয়ে গেল। তাপসী একটু হেসে টুকরোগুলি নিজের হাতের রাঙা তালুটি ভরে' তুলতে লাগল। পরে বাঁ হাতটি ছুঁড়ে টুকরোগুলি জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। সেই দক্ষিণের জানলা দিয়েই। ওর চুলের খোঁপায় একটা ম্লান রজনীগন্ধার কুঁড়ি গোঁজা,—কে যেন দিয়েছে। শুকনো ফ্যাকাসে প্রায় মরা একটা ফুল।

তাপসী বল্লে—এই চশমাটা পরলে আমাকে কেমন মানায় বল ত? ফ্রেমের এই রংটা আমাকে সুট করে না, না? বল না, কেমন দেখতে হয়েছি।

—বেশ। চশমা না পর্‌লেই বোধ হয় বেশি ভালো। জানি না।

তাপসী হঠাৎ বল্লে—আমি তাসের একটা নূতন ম্যাজিক শিখেছি, দেখবে? ধর দিকিন্।

দুটি হাত নেড়ে নেড়ে তাস ভাঁজে, শাড়ির আঁচলের তলায় সেমিজের মধ্যে হাত সাফাই করে' তাস লুকিয়ে ফেলে, সুখেন্দু বেশ টের পায়,—হাঁদার মতো বল্লে—বাঃ, গ্র্যাণ্ড ত'! কি করে' শিখলে? আমাকে শেখাবে?

তাপসী দু'য়েক বার ঘাড় দোলায়, গুছি গুছি চুলগুলি দোলে সঙ্গে সঙ্গে,—পরে বল্লে—এ ত' নেহাৎ সোজা। এই দেখ,—কেমন,—ব্যস্,—হয়ে গেল।

তারপর দু'জনে পেটাপেটি খেলে।

সুখেন্দু ফতুর হয়ে গিয়ে হাসে।

তাপসী বল্লে—মেজদাটা এখনো আস্‌ছে না ত'? তুমি ঘুমুবে? বেশ ত' ঘুমোওনা, বিছানা পেতে দেব? এক ফাঁকে এক পেয়ালা চা করে' দি,—কেমন? কেন যে ঐ গুঁড়োগুলো নাকের মধ্যে ঢোকাও?—আচ্ছা আমাকে দাও ত' একটু। হ্যাঁচ্চো,—বাবাঃ।

সমস্ত মুখ রাঙা, দুই চোখ ছল্‌ছল,—যে কারণেই হোক;—সুখেন্দু দেখে বিভোর হয়।

তাপসী বল্লে—তোমার ক্লাশ এত সকালে রোজই শেষ হয় না কি? রোজই ত' তা হলে আস্‌তে পার। কি করে'ই বা আস্‌বে? যে রোদ্! তোমার বাড়ির সব কেমন আছে?

সুখেন্দু বল্লে—এক ভাইপোর নিদারুণ অসুখ, বাঁচে কি না ঠিক নেই।

সব পুনকে টুনি-পাখীর বাচ্চা। সমস্তটা বাড়ি কিচিরমিচিরে অস্থির। তার ওপর দুই বৌদির ঝগড়া,—সে এক দেখবার জিনিস। তুমি শুনবে? হেসে গড়িয়ে পড়বে একেবারে। পুঁই-চচ্চড়িতে কতটুকু নুন দিতে হবে,—তা নিয়ে যত আঁখুটি, কে বড় রাঁধুনে, কার বাপের বাড়িতে কয় ঝাঁক পুঁই গজায় তা নিয়ে কোঁদল। মেজদা'র লিভারের ব্যথার জন্য দিন পনেরো আপিস্-কামাই করার দরুণ চাকরিটি খোয়া গেছে,—সব চমৎকার আছে কিন্তু! হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলা হয় নি,—আমার এক জামাইবাবু কাশীতে কলেরায় মারা গেছেন মাস খানেক হোল। বোনকে সব কি বলে' বোঝায় জান?—বলে, তোর স্বামীকে বিশ্বেশ্বর হাতে তুলে নিয়েছেন মা, এবার থেকে বিশ্বেশ্বরই তোর,—আর বলে না কিছু, বোধ হয় বলতে চায়—প্রাণেশ্বর।

বলে' সুখেন্দু হাসে ও পরিপূর্ণ চোখে তাপসীর পরিপূর্ণ দেহের দিকে তাকায়।

তাপসী হঠাৎ বল্লে—একটা মজার জিনিস দেখবে? খুব ইন্টারেস্টিং। কাল আমার রাঙাদি এসেছেন।—বলে' কোমর ঘুরিয়ে ছুটে গেল।

তক্ষুনি কোলে করে' একটি সদ্য-ঘুম-ভাঙা শিশু এনে বল্লে—দিদির ফাষ্ট বয়,—শো'-তে ফাষ্ট প্রাইজ পেয়েছে,—কি রকম তাগড়া জোয়ান দেখেছ? এটার নাম হাবলুহাতি,—নেবে কোলে?

বলে' সেই পরিপুষ্ট শিশুটিকে বুকে ফেলে শব্দ করে' করে' ওর মুখ চুমোয় আচ্ছন্ন করে' একেবারে তাতিয়ে ফেল্লে। সুখেন্দু তাই দেখে।

শিশুকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এসে বল্লে—এবার তোমাকে চা তৈরি করে' দিই, কি খাবে? চা, কোকো, না ওভেলটিন? এখেনেই সব নিয়ে

আস্‌ছি। দেখবে একটা নতুন রকম কনসার্ট? পিরিচে চামচ বাজিয়ে গান গাইব,—গুন গুন করে' অবশ্যি।

মেঝের ওপর পা গুটিয়ে বসে' ঘাড়ের থেকে আঁচলটা পিঠের ধার দিয়ে নামিয়ে তাপসী স্টোভ ধরায়, আর গুনগুনায়।

একটা অকারণ, অর্থহীন দিন। নিস্তব্ধ গুমোটের পর দুঃখ-ভুলানো খাম্‌খেয়ালি দখিনার মতো। 'ভেসে যাওয়াই তার ভালবাসা।' একটা রঙচঙে ফুরফুরে প্রজাপতি যেন,—পথ ভুলে এসে দুটি পলকা পাখা নাচিয়ে গেল।

মনে করে' রাখবার মতো দিন,—হিসাবের খাতায় এমন দিন একটিও আসে না কোনকালে,—সুখেন্দুর সমস্ত দেহ যেন স্নান করে' শীতল হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক সমস্ত জীবনের সঙ্গে এই দুপুরের দুটি অলস প্রহর কি বেখাপ্পা,—ভিড়ের মধ্যে যার মুখ চেনা যায় না, নিরালায় তাকে বন্ধু বলে' ডাকা!—এমন কথা কে কবে ভেবেছে?

সুখেন্দু ভাবলে,—আর ও-বাড়ি যাবে না, আর ত' ওকে তাপসী 'তুমি' বলে' ডাকবে না কোনোদিন, যদি আর কোনোদিন না বলে— 'রোজ রোজই তা হ'লে এসো।'

বাড়ির দৈনিক নোংরা ছবি আর আজ ওকে পীড়িত করলে না। উদরাময়ে যে যে শিশুগুলি ভুগছে, তাদের একটুখানি আদর করলে। উঠানে দুই বৌদি বাসন মাজতে বসে' তেমনি ঝগড়া করছে ও বে-বল

বাইরে প্রয়োগ করতে পারছে না সেটা হাতের বাসনগুলির ওপরই পর্য্যবসিত হচ্ছে।

সুখেন্দুর ইচ্ছা হ'ল একবার চেঁচিয়ে ওঠে—তোমরা উলু দাও শিগগির।

শুধু বল্লে—আজ রাতে সুন্দর চাঁদ উঠবে, মাঠে বেড়াতে যাবে মেজবৌদি? যাবে বেড়াতে বড়বৌদি? খোকা ত' ভালই আছে একটু আজ।

বৌদি দু'জন তাড়াতাড়ি বাসন-পত্র ধুয়ে ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি বাছতে বসল। বড় বলে—চাঁদের আলোয় এটা মানাবে এই শাদা ধবধবেটা। মেজ বলে—ছাই! মানাবে এই মেঘ-রঙিটা।

সুখেন্দু এসে বল্লে—ওটুকু বেড়ানোয় কিচ্ছু হবে না আমার। আমি 'বাস'-এ এক্ষুনি নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছি।

ঠাঠারি-বাজার হয়ে নবাবপুরে না পড়লেই যেন নয়। পানউলির সঙ্গে দেখা।—সুখেন্দু ভাবলে—পান কেনা যাক্, আর যদি নস্যি পাওয়া যায়। পয়সা চারেকের একসঙ্গে।

রুক্মা হঠাৎ অতি যত্ন করে' টাটকা পান সেজে দিলে। যেন তাতে ওর অন্তরমধুও মেশানো দিল। সুখেন্দু হঠাৎ বল্লে—কবে এখানে এসেছ?

যার সঙ্গে আজ ওর দেখা, তারই সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব।

রুক্মা বল্লে—দিন চারেক। একটা ভালো জায়গায় ঘর দিতে পারেন? এখানে তেমন বিকোয় না।

সুখেন্দু বল্লে—জর্দা আছে? দাও। দেখব নবাবপুরে পুলের ধারে ঘর পাওয়া যায় কি না। কেন, এখেনেই ত' বেশ নিরালা। দাঁড়াও না, একবার সহরে ঢাক পিটিয়ে দিচ্ছি, সব সুড়সুড় করে' পান কিনতে আসবে। কি নাম তোমার?

যেমন করে' তাপসী বসেছিল চা করে' দেবার সময়—যেমন তাপসীর দুটি হাতের চারু-কুশলতা!

রুক্মা বল্লে—নাম-টাম নেই।

সুখেন্দু চলে' যাচ্ছিল, রুক্মা পেছন থেকে ডাকলে—চুণ লাগাবে না? চুণ নিন্ একটু।

—হ্যাঁ, মুখ পুড়িয়ে ফেলি আর কি।

আবার যাচ্ছিল, রুক্মা আবার ডাক্লে—একানির পয়সা নিয়ে যান।

—কেন, চার পয়সারই ত' কিনলাম। ও, এক পয়সা বাকি? ও নিয়ে কি হবে? এখান দিয়ে একটা ভিখিরি হেঁটে গেলে দিয়ে দিয়ো। নইলে অম্নি ছুঁড়ে দিয়ো, যে পায়।

কোর্টের কাছ থেকে সুখেন্দু 'বাস' নিলে।

উঁচু নীচু এবড়ো পথ,—মোটর লক্ষ্যহীনের মতো ছুটেছে। পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে চলেছে,—এ পারে নিষ্পাদপ বিস্তীর্ণ মাঠ, বুকের ওপর দিয়ে কালো কঠিন রেল্-লাইন। চাষাড়া ষ্টেশনে নেমে সুখেন্দু চেনা ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে খানিক বাজে গল্প করলে,—এবারে কি রকম পাট হোল, নতুন লাল রাস্তাটার ধারে জমির কাঠা কত

করে', ষ্টেশন-মাষ্টারের ছোট ছেলে রেলে কাটা পড়া সত্ত্বেও উনি চাকরি ছাড়লেন না কেন?

শেষ ট্রেনে ফিরে এল সটান বাড়িতে নয়,—পল্টনের মাঠে, অশ্বত্থ গাছের তলায়।

মেজবৌদি তখনো ঘুমুতে যায় নি, তারই সঙ্গে সুখেন্দু একটু কোমল করে' কথা কইল: মাঠে বেড়াতে যাবে? আমাদের বাড়ির এত কাছে এত বড় মাঠ, এমন উধাও-পাওয়া হাওয়া, কি ভাবনা আমাদের। আর শাড়ি বদলাতে হবে না, এমনিই তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আজকের ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো মেঘে মুছে গেছে,—তা যাক্। এই অন্ধকারই কি কম সুন্দর? বাইরে বেরিয়ে একবার দেখ এসে, মেজবৌদি।

মেজবৌদি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাইরে বেরিয়ে এল। এত বড় মাঠ ও এই অবারিত অন্ধকার দেখে বৌদির হৃদয়ও যেন অতি সহসা বড় হয়ে গেছে।

বল্লে—বড়দিকে ডেকে আনো না ঠাকুর-পো, কি চমৎকার আকাশ আজ। নিশ্চয়ই জল হবে। জলে আজ ভিজবে ঠাকুর-পো?

মোচার খোল্ দিয়ে দুজনে নৌকো তৈরি করে, মেজবৌদি তাতে মাটির একটি মৃদু বাতি বসিয়ে দেয়, গায়ে কাঠি পুঁতে সুখেন্দু পাল খাটায়,—তারপর ভাসিয়ে দেয় পুকুরে। হাত দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে দুজনে ঢেউ তোলে।

কতদূর ভেসে গিয়ে নৌকো তলিয়ে গেল কাৎ হয়ে। তাই দেখে মেজবৌদি হাত-তালি দিয়ে উঠল,—খুকির মতোই আহ্লাদে আটখানা।

মেজবৌদিকে এখন ঠিক তাপসীর মতো সুন্দর।

সুখেন্দুর মন যেন বেতারে মেজ বৌদিরো মন ছুঁয়েছে। মেজবৌদি বলে—আজকে মাঠে ঘুমোবার রাত কিন্তু।

সুখেন্দু বলে—তুমি ঘুমোও। আমি একটু ঠাঠারি-বাজারে ঘুরে আসছি।

মানে, এই রাতে রুকুমাকে ও একটু দেখে আসবে।

আঙুল ফুলে' কলা গাছের মতো,—ব্যাঙের গলা ফুলে' হাতি।

ছিল একটা ফাড়ি, বেচত পান,—হোলই বা না কেন কম্‌লিফুলি পাৎলা শাড়ি পরে',—তা, ছ'মাসেই কি দোকান এম্‌নি ফেঁপে উঠবে? তাও এই পটিটায়,—যেখানে লোহা পিটিয়ে, গা-গতর দিয়ে দিন রাত খেটে খেটেলরা মুঠো ভরে' পয়সা পায় না, সেখানে? গদিয়ান হয়ে যেই বসা, তখন থেকেই ওর চারধারে গাঁদি লগে গেছে। আদেখলে অপ্পেয়ে যত সব।—কেনই বা জাঁকবে না দোকান?

পানের দোকান,—এখন মণিহারি।

রাত্রে রুকুমা যখন নিথাটু,—দোর দেবে,—নৃসিংহ গল্প করতে আসে।

রুকুমা দরজা বন্ধ করতে করতে বলে—তোমার বৌকে ত' আমার সেই শাড়িটা দিয়ে দিয়েছি যেটা পরাতে আমাকে নাকি খুব মানিয়েছিল—

নৃসিংহ বলে—ও তো একটা বুড়ি, ঝগড়াটে, ছিচকে,—

—কিন্তু এছাক মিঞাকে জিজ্ঞেস কর দিকিন? সিঁদ না কাটলে হয়।

পরে বলে—আমারো পাঁচ সোয়ামী ছিল, কারুরই ভালো লাগত না আমাকে। আমারো না।

দরজা বন্ধ করে' দেয়। নৃসিংহ ঘরে গিয়ে বৌকে পিটায়,—বৌ মারমুখো চড়া হয়ে গেছে আজকাল।

নৃসিংহ ঠাঠারি-বাজার ছেড়ে দিয়ে রেকাবি বাজারে গিয়ে উঠেছে। সেখানে জাঁতা ঘোরায়।

ভাই-পো মারা গেছে কাল রাত্রে,—একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে' সুখেন্দু সারা সকালটা টো টো করছিল,—মনে মন্‌চে পড়ে' গেছে।

রুকমা হঠাৎ গাড়ির পা-দানির কাছে এসে বলে—কোথায় যাচ্ছেন বাবু? অনেকদিন এ দিকে আসেন নি। কি হয়েছে আপনার?

গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলে। সুখেন্দু অবাক হয়ে বলে—দোকান বেড়ে বাড়িয়ে ফেলেছ ত'? শুধু পান বেচেই, না আরো কিছু?

রুকমা সোনার অধর ঈষৎ কুঞ্চিত করে' বলে—দাঁড়ান, দরজাটায় তালা দিয়ে আসছি,—আমাকে একটু গাড়ি চড়ান্। বলছি সব।

কে একজন দোকানের দরজা থেকে রুকমাকে হাঁকলে, কি কিনবে—সুখেন্দু চেয়ে দেখে—প্রসন্নবাবু। রুকমা আস্তে বল্লে—যদি এক টাকার

কিছু কেনে ত' এক ঘণ্টা গল্প করে' যাবে। এক দিন এমনি গাড়ি নিয়ে এসে আমার দরজায় থেমেছিল। আমি আজকের মতো সেধে চড়তে চাইনি কিন্তু। দাঁড়ান—

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখে গাড়ি নেই।

বিগতযৌবনা রুক্মা.—মা রুক্মা,—পঞ্চস্বামীর উপহৃত পাঁচ-পাঁচটি সন্তান পর পর মারা গেছে—তথাকথিত অসতী রুকমা,—হঠাৎ আজ বিমনা হয়ে গেল। দেহের দোকানপাটের বাইরে চলে' এসে নিজের দেহকে আজ ও খুব সুন্দর করে' দেখছিল বুঝি। নিজের তেতো মন দিয়ে দেহকে হঠাৎ মিঠা বলে' আস্বাদ করল। রুক্মা চুপ করে' বসে' থাকে আর চোখ নীচু করে' নিজের পায়ের আঙুল দেখে।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে,—একটা কামরা থেকে তাপসী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আসুন সুখেন্দুবাবু। যাবেন নারায়ণগঞ্জ? চলে' আসুন শিগগির।

সুখেন্দু ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়ল।

তাপসী বল্লে—আমি নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছি,—একা। মেজদাকে কত বল্লাম আসতে, এল না। কেন যাচ্ছি? আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে আজ এসে পৌছুবেন, তাঁকে এস্কর্ট করতে। ভুল বলছি,—বার্লিন থেকে আসছেন। আপনি প্লাটফর্মে ঘুরছিলেন যে?

—এম্নি। কাজ নেই কিছু। 'হলে' একটা ভাল বই দেখে এলাম, পয়সা নেই।

তাপসী ওর চুলের খোঁপাটা ফের বাঁধতে বাঁধতে বল্লে—কেমন আছেন? অনেকদিন আর আপনাকে দেখিনি। আমাদের ওখানে ত' আর যান্‌ও না।

এ ত' আর সেই গুঞ্জনক্লান্ত স্তব্ধতাপরিপূর্ণ রৌদ্রালোকিত দুপুর নয়,—এ সন্ত্রাগ্রত ব্যস্ত মুখর প্রভাত,—সেই সান্ত্বনাসিঞ্চিত নাড় নয়, একটা কুৎসিত রেল্‌-ষ্টেশন। তা ছাড়া,—ওকে তাপসী আর কেন 'তুমি' বলে' ডাকবে?

সুখেন্দু বল্লে—ভালো না। বি, এ-তে ফেল্‌ মেরেছি। মেজদা টাইফয়েডে ভুগছেন। একটা কাজ কোথাও জুটছে না।

তাপসী ওর শাড়ির আঁচলটা নতুন করে' ফের্‌তা দিয়ে পরে' বল্লে—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ কি সুন্দর রোদ্‌ সুখেন্দু বাবু, না? এই এবড়ো মাঠগুলি একদিন বেরিয়ে এলে কেমন হয়? একটি একটি দিন করে' চার বছর,—তিনশ পঁয়ষট্টিকে চার দিয়ে গুণ কর্‌লে কত হয়?—ততগুলি দিন বসে' বসে' গুনেছি। আজকে আ... বিগ ডে। বলে, আর সমস্ত দেহ চঞ্চল হয়ে উঠে।

সুখেন্দু হঠাৎ বল্লে—যদি ষ্টিমার ডুবে যায়? কোন কারণে আজ যদি না আসেন?

তাপসী ঘাড় নেড়ে বল্লে—তা ককখনো হতে পারে না। আজকের এই রোদ দেখে কি আপনার তাই মনে হয়? আমার সমস্ত মন এমন কি আমার এই কড়ে' আঙুলটা পর্য্যন্ত বলছে তিনি আসবেন। আপনার কি তাই মনে হচ্ছে না? বলুন না।

আস্‌বেন বৈ কি।

অধিবাস

প্যাণ্ট-কোট-পরা হ'লেও সুখেন্দুর চিনতে দেরি হ'ল না—এ যে সেই মানকে!—কলেজে ঢুকেই যে মা'র বাক্স ভেঙে জাহাজের খালাসী হয়ে পালিয়েছিল। অদ্ভুত! ছিল একটা চাম্‌চিকে—হ'ল কি না প্রজাপতি! ক্লাশে ত' সবাই ওকে খেপাত—উট কোথাকার।

তাপসী আর ওর বন্ধু দু'জনে পরস্পরের দিকে পলকহীন চোখে যেন এক যুগ চেয়ে থাকে, আনন্দে তাপসীর দুই চক্ষু ছলছল টলটল করে' ওঠে. —সেদিনকার বাজে চোখের জলের সঙ্গে কি সুদূর তফাৎ—মাণিক তাপসীর শিথিল দুর্ব্বল একখানি হাত জোরে চেপে ধরে, কিছু বল্‌তে পারে না,—জনতার এক কোণে নিশ্বাসে দুজনের বুক দোলে, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয়, অণুরণিত।

তারপর মাল-পত্র গাড়ি ঠিক-করা, বাড়ির সব কেমন আছে, সহরে দাঙ্গা এখনো আছে কি না—এই নিয়ে মামুলি দুয়েকটি কথা। হাত-ধরাধরি করে'ও হাঁটে না।

মাণিক শুধোয়—কি কর আজকাল?

সুখেন্দু ওর কান্তিমান্ প্রফুল্ল দেহের দিকে চেয়ে বলে—ঘাস কাটি।

মাণিক বলে—সে ত' খুব ভালো বিজিনেস্।

সুখেন্দু ওদের গাড়িতেই উঠতে চাইছিল না, মাণিক হাত ধরে' টেনে তুল্লে। তাপসী হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে,—কিন্তু মাণিক ওর বুকে কান পেতে শুন্‌তে পারে!

তাপসী ওর খোঁপার থেকে একটি বিবর্ণ শুক্‌নো রজনীগন্ধার কুঁড়ি বের করে' বলে—চেন একে?

মাণিক ওর পকেট থেকে একটি ছোট্ট রুমাল বের করে' বলে—আমার মণিবন্ধে আবার তেম্‌নি বেঁধে দাও।

তাপসী বলে—হল্‌দে স্থতো দিয়ে?

স্থখেন্দুর সাম্‌নেই ওরা রহস্যালাপ করে। মুখোমুখি দু' জনে বসেছে পায়ে পা ঠেকিয়ে। দু' জনের দেহ যেন মদের পেয়ালের মতো টল্‌টল্‌ কর্‌ছে।

•

তাপসী ও মাণিকের বিয়েতে স্থখেন্দু খেটে নিলে,—প্রাণপণ। এম্‌নি। বন্ধু হিসেবে ওকে দু' জনেই নেমন্তন্ন করেছে,—সেই ওর আনন্দ ও অহঙ্কার। প্রসন্নবাবুর পাতে ও একেবারে গোটা বারো রসগোল্লা ঢেলে দিলে। বল্লে—খান্ আর লুফুন।

হঠাৎ কতক্ষণ বাদে ওর মনে হ'ল—বোকার মতো খেটে মরছি কেন?—আমার কি? আমার ত' আর পৌষমাস নয়,—জ্যৈষ্ঠই।

দইর ভাঁড়টা ফেলে রেখে স্থখেন্দু হঠাৎ বেরিয়ে গেল। ওর সেই মাঠে, সেই পুকুরের ধারে,—সেই অশ্বত্থ গাছের তলায়!

বাসর-ঘরে তাপসী মাণিককে বল্লে—স্থখেন্দুবাবু কেন হঠাৎ চলে' গেলেন বলতে পার? নিশ্চয়ই ওঁর মন ভালো নেই। এত খেটে একগ্লাশ জল পর্য্যন্ত চুমুক দিলেন না। ওঁর ভারি অর্থকষ্ট হচ্ছে—তুমি ওঁকে কিছু টাকা দিয়ো,—এম্‌নি—বলো বিজিনেস্ করতে।

পরদিন মাণিক স্থখেন্দুর সন্ধান পেলে না,—যে দিন পেলে বল্লে—তোমাকে এই টাকাগুলি তাপসী দিয়েছে বিজিনেস্ করতে।

সুখেন্দু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে—বিদ্যেবুদ্ধি নেই, কি বিজেনেস্ করব ?

মাণিক বলে—দেখ না চেষ্টা করে'। না চললেও বরং কিছু অভিজ্ঞতা ত' মিলবে। তাপসীর সমস্ত স্বত্ত্ব তুমি গ্রহণ কর,—ও বলে' দিয়েছে।

সুখেন্দু টাকা নেয়। এই টাকা না নিলে বিজিনিস্ আর সে করবে কী করে' ?

ঠাঠারি-বাজারেই দোকান দেয় একটা,—মণিহারি ;—রুকুমার দোকানের পাশে।

রুকুমার সমস্ত দেহ ফুলের মতো যেন প্রস্ফুটিত হতে থাকে—ওর দেহ যেন বর্ষাকালের সবুজ মাঠ,—আবার সজীব হয়ে উঠেছে।

যে-জিনিস রুকমা বেচে পাঁচসিকেয়, সেই জিনিষই পাশের দোকানে বসে' সুখেন্দু বেচে—একটাকা তিন আনায়। প্রতি জিনিসের দর কমিয়ে কমিয়ে এমনি প্রতিযোগিতা করে। অবশেষে রুকমা হাল ছেড়ে দেয়।

প্রসন্নবাবু এসে বলেন—আমি দিচ্ছি টাকা, ফের দোকান জাঁকিয়ে ফেল'। দেখি ও কেমন করে' তোমাকে নাস্তানাবুদ করে ?

রুকমা বলে—দোকানে আমার মন নেই বাবু। অনেক দোকান দিয়েছিলাম,—

কথা ভারি করুণ, যেমন করুণ ওর আজকের এই ফিকা নীল রঙের ফিন্‌ফিনে শাড়িটা। রুকমা ঝাঁপ বন্ধ করে' দেয়।

আসন্নসন্ধ্যার ভীতু অন্ধকারের মতো রুকমা সুখেন্দুর দোকানে এসে

বলে—আমার ঘরে না-বেচা অনেক জিনিস আছে,—আপনি নিন। দোকান উঠিয়ে দিলাম।

সুখেন্দু খুসি হয়ে বলে—কত নেবে ?

রুকুমা হেসে বলে—পয়সা দেবেন নাকি ? নাই বা দিলেন। মাগনা আরো কতও ত' দিতে পারি—

হিসেবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত সুখেন্দু বলে—দিয়ে যেয়ো, দাম একটা ধরে' দেব।

খানিক পরে বলে—দাঁড়িয়ে আছ যে।

রুকুমা বলে—আরো কিছু দেবার ছিল যে—

—কি ?—সুখেন্দু বিরক্ত হয়ে ওঠে।

রুকুমা বলে—আমাকে আপনার দোকানে রাখুন না—

—মেয়ে মানুষ রাখলে খদ্দের আসবে বটে, কিন্তু সুনাম যাবে। তুমি যাও।

রুকুমা এক এক করে' সব জিনিসগুলি দিয়ে যায়।

সুখেন্দু হঠাৎ বলে—তোমার হাতে ওগুলি কিসের দাগ ? ক'টা ?

—পাঁচটা। পাঁচ স্বামীর। আরেকটা দিতে হবে।

সুখেন্দু তেমনি হঠাৎ বলে' বসে—তুমি থেকে যাও রুকুমা, আমারই দোকানে—

রুকুমা বলে—না। আমি রেকাবী-বাজারে যাচ্ছি—

মানে, নৃসিংহের সন্ধানে।

নৃসিংহ তখন মাঝি,—দেখা মেলে না। রুকুমা ফিরে আসে। বলে —এই দেখ হাত, ছ'টা দাগ। পরে বলে—[illegible] না।